বিচিত্র-চিত্র-সংগ্রহ

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৭

মূল্য—

ভূমিকা

উনবিংশ শতকের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক গণের লেখা হইতে পনেরটি কথা-চিত্র এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রত্যেকটি লেখার মধ্যেই গল্পাকারে রহিয়াছে চিত্রাঙ্কন—প্রত্যেকটিই আবার আপন বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র ; এই জন্যই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে বিচিত্র-চিত্র-সংগ্রহ। লেখাগুলির সঙ্কলয়িতা শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় নিজে বর্ত্তমানে অসুস্থ ; নিজে তিনি এগুলি মুদ্রণকালে ভাল করিয়া দেখিয়া দিতে পারেণ নাই ; মুদ্রণ-ব্যাপারে কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হইলে তাহার জন্য দায়ী আমরা।

নিবেদক—

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৭

সূচী

নারদের মায়াদর্শন

—রাজেন্দ্রলাল মিত্র

একদা দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতপূর্ব্বক বিষ্ণুর চরণ বন্দনা করিয়া স্বীয় স্কন্ধাবলম্বনী বীণাযন্ত্রে বিষ্ণুগুণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। লোক-পতি বিষ্ণু নারদকে সন্দর্শন করিয়া বিশেষতঃ নারদের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া দেবর্ষিকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন—'দেবর্ষি, বহু দিবসের পর তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া অদ্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, বিশেষতঃ তোমার অমৃত-তুল্য বীণাবাদ্য-শ্রবণে আমার সাতিশয় সন্তোষ জন্মিয়াছে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তুমি আমার নিকট হইতে তোমার অভিলষিত কোন প্রকার বর প্রার্থনা কর। বৈকুণ্ঠে-শ্বরের এতাদৃশ কৃপাবাক্যশ্রবণে দেবর্ষি নারদ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া দুই নেত্রে অনবরত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—"হে কৃপানিধান, যাহা আমার চরমাভিলাষ, তাহাই তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইয়াছে, আর আমি কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা করিব? লোকে জন্ম জন্ম যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা করিয়াও যে ফল প্রাপ্ত হয় না, আমি অনায়াসে সেই ফল লাভ করিতেছি, যে পরম প্রার্থনীয় পুণ্যধামে আগমন করিবার জন্য কত লোকে শত শতবার কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শত শতবার শরীর ধারণপূর্ব্বক শত শত প্রকার সাধন-তৎপর হইতেছে, আমি তোমার প্রসাদে অব্যাহত গতি লাভ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই দেবদুর্লভ পবিত্র ধামে আগমন করিতেছি। অতএব ইহাপেক্ষা ত্রিলোক-মধ্যে যদি আর কোন বাঞ্ছনীয় বিষয় থাকিত, তাহা হইলে আমি সেই বিষয়ের বর গ্রহণ করিয়া আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিতাম। তবে আমার এই একমাত্র অভিলাষ আছে —মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীব-জন্তুকে তুমি যে ভগবৎ-মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া বিশ্ব-সংসার মধ্যে আপনার বিচিত্র মহিমা প্রকাশ করিয়াছ, তোমার কৃপায় আমি জীবন্মুক্ত হওয়াতে সেই মহামায়ার অধিকারচ্যুত হইয়াছি, অতএব সেই মায়া যে কি পদার্থ, মধ্যে মধ্যে তাহাই আমার জানিবার অভিলাষ হয়।"

বৈকুণ্ঠনাথ নারদের এতাদৃশ মনোভীষ্ট শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "নারদ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, এইজন্য আমি তোমাকে জীবন্মুক্ত ও মায়াতীত করিয়াছি, অতএব তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তবে আমি চিরদিন ভক্তাধীন, ভক্তকে আমার অদেয় কিছুই নাই; বিশেষতঃ অদ্য আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। তুমি একান্তই যদি আমার বিশ্বমোহিনী মায়ার সন্দর্শন করিতে

অভিলাষী হইয়া থাক, তবে অবশ্যই তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে ; কিন্তু তথাপি কহিতেছি, অদ্য তুমি আমার নিকট অন্য প্রকার বর গ্রহণ করিলে ভাল হইত।"

দেবর্ষি বৈকুণ্ঠনাথের বাক্যে আর কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কিয়ৎকাল মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, অনন্তর পূর্ব্বমত ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া সে দিবস বিদায় লইলেন।

নারদ বিষ্ণুলোক হইতে প্রত্যাগমন কালে মনে করিলেন যে, বহু দিবস কৈলাসনাথ পার্ব্বতীশ্বরের দর্শন লাভ করি নাই, অতএব অদ্য যদি স্বর্গলোকের পথে আসিয়াছি, তবে এই সুযোগে কৈলাস হইয়া হর-পার্ব্বতীর চরণ দর্শনপূর্ব্বক নয়ন সফল করিয়া যাই। এই বিবেচনা করিয়া নারদ হিমাচলাভিমুখে গমন করত ক্রমে সুর-নদী মন্দাকিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিলেন ;—অদ্য কি শুভদিন, অদ্য ইষ্ট দেবতার চরণ সন্দর্শন হইল, এবং সেই সুকৃতিতে বোধ হয় কৈলাসেশ্বরেরও দর্শন-লাভ সংঘটন হইতে পারিবে, তাহাতে আবার সম্মুখে পতিতপাবনী মন্দাকিনী! আহা, আজি অনেক দিনের পর মন্দাকিনীর শীতল জলে স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করিব। এই বলিয়া নারদ সেই সুরপুর-বিহারিণী মন্দাকিনীর তটস্থ এক বৃক্ষমূলে আপনার উত্তরীয় বস্ত্র ও বীণাযন্ত্র সংস্থাপন করিয়া মন্দাকিনীতে অবরোহণ করিলেন এবং সেই সুনির্ম্মল জলে সর্ব্বশরীর শীতল করিয়া অবগাহনান্তে মস্তকোত্তোলন করিলে আপনার পূর্ব্বের সমস্ত ভাবে বঞ্চিত হইলেন। নারদের সে আকার নাই, সে ভাব নাই, সে বেশ নাই এবং সে-প্রকার দিব্য জ্ঞান ও তপোবল কিছুই নাই। সে মন্দাকিনীও নাই এবং সে হিমাচলও নাই। এককালে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নারদ মন্দাকিনী হইতে গাত্রোত্থান না করিয়া মর্ত্ত্য-লোকস্থিত এক নিবিড় অরণ্যস্থ জলাশয় হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাধ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল।

ব্যাধরূপী নারদ সরোবর হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহারান্বেষণের নিমিত্ত সেই অরণ্য-মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না। ক্রমে যত দিবা অবসান হইতে লাগিল, ততই আরও ক্ষুধার যন্ত্রণার সঙ্গে ভয়-বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। ব্যাধ একে ক্ষুধায় কাতর তাহাতে আবার সমস্ত দিবস, পর্য্যটনের ক্লেশে শ্রান্ত হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং অতি কষ্টে কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক অবশেষে হতাশ হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল।

ব্যাধ মনে করিল যে, সমস্ত দিবা তো অনশনেই ক্ষেপণ করিলাম, এক্ষণে রজনী উপস্থিত, এই অরণ্যের মধ্যে যদি সমস্ত রাত্রি এই বৃক্ষ-মূলে থাকি ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে কোন হিংস্র জন্তুর হস্তে প্রাণ হারাইতে হইবে ; অতএব এই সময় সম্মুখস্থ এই শালবৃক্ষ আরোহণ করিয়া থাকি, নতুবা আর একটু বিলম্বে অন্ধকার ঘোর হইলে কিছুই দেখিতে পাইব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যাধ সত্বরেই সেই শালবৃক্ষে আরোহণ করিল এবং পরিধেয় চীরাম্বরের এক পার্শ্ব দিয়া আপনার শরীর তাহার শাখার সঙ্গে বদ্ধ করিয়া

রাখিল। ক্রমে রজনী যত গভীর হইতে লাগিল, ততই সেই জনশূন্য নিবিড় অরণ্যের ভীম মূর্ত্তি আরও ভীষণ হইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে ব্যাধ সেই বৃক্ষের উপর সমস্ত রজনী ক্ষেপণ করিয়া প্রাণস্বরূপ প্রভাতের প্রিয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্বাশ্রিত পথাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে বহু দূর অতিক্রম করিয়া গেল, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র আহারের সংঘটন হইল না।—কেবল পিপাসা হইলে এক একবার এক এক জলাশয়ে গিয়া এক এক অঞ্জলি জল পান করিয়াই ব্যাধ প্রাণধারণ করিতে লাগিল। এইরূপে তিন দিন গত হইল, কিন্তু কোনস্থানে কোনপ্রকার আহারোপযুক্ত ফল-মূলও দেখিতে পাইল না, এবং নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও কোনমতে সে অরণ্যের পার প্রাপ্ত হইল না। চতুর্থ দিবসে ব্যাধ অনাহার এবং পর্য্যটনের ক্লেশে শ্রান্ত হইয়া একেবারে কাতর হইয়া পড়িল, আর তাহার চলিবারও সামর্থ্য রহিল না। কি করিবে! আপনার আসন্ন মৃত্যু স্থির জানিয়া এক প্রকাণ্ড তরু-মূলে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া রহিল।

ক্ষণেক কাল পরে তাহার পৃষ্ঠে একজন মনুষ্যের হস্তাঘাত অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক দেখে যে সর্ব্বাঙ্গে শোণিত-ধারা-বিশিষ্ট একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, আপনার স্কন্ধস্থিত ধনুকের ছলে কতগুলি শিকার করা পশু বদ্ধ করিয়া লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং তাহাকে গাত্রোত্থান করিতে কহিতেছে। ব্যাধ ভঙ্গীক্রমে তাহাকে দেখাইল যে গাত্রোত্থান করিবে কি! সে কয়দিন আহার-অভাবে এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আর স্পষ্টরূপে কথা কহিবারও শক্তি নাই।

সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ মৃতকল্প-ব্যাধের নিকট হইতে এবম্প্রকার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া অতি সত্বরে আপনার স্কন্ধ-বিলম্বিত ঝুলির মধ্য হইতে চকমকি বাহির করিয়া শীঘ্রই অগ্নি সংস্থান করিল এবং নিকট হইতে কতকগুলি শুষ্ক পত্র সংগ্রহপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে তিন-চারিটি খরগোশ দগ্ধ করিল এবং তাহা তৎক্ষণাৎ লবণাদি উপকরণ-দ্বারা খাদ্যোপযুক্ত করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাধকে খাইতে দিল। ব্যাধ সেই দগ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি কাতর স্বরে সেই প্রাণদাতা পুরুষকে ঐ দুরবস্থা হইতে তাহার পরিত্রাণ করিতে কহিল। শিকারী কহিল—"ভাল, যখন আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আর তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি আমাকে অনুরোধ না করিলেও আমি কখন তোমাকে এ প্রকার অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিতাম না। কিন্তু তুমি কে? কোথায় গমন করিতেছ এবং কি প্রকারে এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ? অগ্রে সেই সকল আমাকে পরিচয় দেও, পরে আমি আমার কার্য্য করিব।"

ব্যাধ তাহাকে জলাশয় হইতে গাত্রোত্থান করণাবধি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষ-মূলে পতিত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিচয় দিয়া কহিল—"তুমি আর কিঞ্চিৎ বিলম্বে আগমন করিলে, বোধ হয়, আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে যদি এই অরণ্যের পার করিয়া দেও, তবেই আমার রক্ষা হয়, নচেৎ

পুনর্ব্বার আমাকে হয় অনশনের হস্তে, নয় কোন হিংস্র পশুর মুখে প্রাণ দিতে হইবে সন্দেহ নাই।"

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শিকারী কহিল,—"ভয় নাই, আর তোমাকে এ প্রকার বিপদে পড়িতে হইবে না। আমি বুঝিলাম, কোন অপরিচিত স্থানে পতিত হইলে লোকের যেমন কখন কখন দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়া থাকে, তোমারও সেই প্রকার হইয়াছে। তোমার আকার-প্রকার দেখিয়া তোমাকে ব্যাধের সন্তান বোধ হইতেছে; আমিও ব্যাধ। তুমি এক্ষণে আমার আলয়ে আসিয়া যত দিন ইচ্ছা বাস কর, পশ্চাৎ তোমার আপনার আবাসে গমন করিবার ইচ্ছা হইলে গমন করিও।"

এই কথা শুনিয়া পথ-শ্রান্ত ব্যাধ ঐ শিকারীর অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমে গিয়া তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, একটি কৃষ্ণবর্ণা অথচ প্রিয়দর্শনা কন্যা সেই কুটীরের ইতস্ততঃ হইতে শুষ্ক পত্র আহরণ করিতেছিল তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র আস্তে আস্তে কুটীরের দ্বারে গিয়া কহিল,—"মা, ঐ দেখো পিতা বুঝি শিকার করিয়া ফিরিয়া আইলেন।"

ব্যাধিনী ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুটীর হইতে বাহির হইয়া ব্যাধের নিকট আসিয়া তাহার হস্ত হইতে ধনু, স্কন্ধ হইতে ঝুলি এবং পৃষ্ঠ হইতে তূণ নামাইয়া লইল এবং প্রশস্ত দুইখানি পত্রাসন আনিয়া দুইজনকে বসিতে দিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে কন্যাটি একটি মৃৎপাত্র করিয়া উষ্ণোদক আনিয়া তাহাদিগকে পদ ধৌত করিতে দিল এবং পূর্ব্বের সঞ্চিত কিঞ্চিৎ ফল-মূল আনিয়াও খাইতে দিল। শিকারী শ্রান্তি দূর করিয়া একটু বিলম্বে আপনার গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিল,—"অদ্য শিকারে গিয়া আর কিছু লাভ হউক আর নাই হউক, এই পথিকটির প্রাণ রক্ষা হওয়াতেই আমার পরম লাভ জ্ঞান হইয়াছে" বলিয়া তাহার নিকট সেই পথিকের সমস্ত বৃত্তান্ত পরিচয় দিয়া কহিল যে—"আমি যেমন ইহাকে দৈব-বশে অরণ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিও তেমনি ইহাকে অদ্যাবধি আপনার পুত্র জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করিবে। ইহা হইতেই বোধ হয় আমাদিগের পুত্র-কামনা পূর্ণ হইবে।"

নারদও ঐ ব্যাধ-ব্যাধিনীর অকৃত্রিম স্নেহে বশীভূত হইয়া নিরন্তর তাঁহাদিগের সন্তোষ-জনক কর্ম্ম করেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার পিতামাতা জ্ঞান করিয়া সেইরূপেই সম্ভাষণ করেন। বিশেষতঃ ঐ ব্যাধ-কন্যার উপর নারদের ক্রমে ক্রমে এমনি অনুরাগ জন্মিতে লাগিল, যে তাহাকে একদণ্ড না দেখিলে স্থির থাকিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিল এবং ব্যাধ-কন্যারও নারদের উপর দিন দিন ঐরূপ অতুল অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের অদর্শনে অস্থির হয় এবং উভয়েই উভয়কে দেখিলে স্বর্গলাভ করে। ব্যাধ-ব্যাধিনী নারদের প্রতি কোন কর্ম্ম করিবার অনুমতি করিলে কন্যাটি তৎক্ষণাৎ করিতে যাইত এবং কন্যার প্রতি তাহারা কোন কর্ম্মের আদেশ করিলেও নারদ আহ্লাদপূর্ব্বক তাহা করিয়া দিত। এইরূপে উহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

উহাদিগের এই প্রকার প্রণয় বৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া ব্যাধ একদিন আপন পালিত পুত্রকে ডাকিয়া কহিল,— 'বাপু, অনেক দিন অবধি তোমাকে একটি কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কেবল সাবকাশাভাবে বলা হয় নাই। আমি দেখিতেছি, আমার কন্যাটির উপর তোমার অত্যন্ত ভালবাসা এবং তোমারও প্রতি তাহার তাদৃশ যত্ন। এই প্রকার ভাব হইয়া বিবাহ হইলে সে স্ত্রী-পুরুষ চিরকাল সুখে কাটাইতে পারে। অতএব তোমার সহিত আমার কন্যাটির বিবাহ হইলে যে তোমরা উভয়েই চিরদিন সুখে কাটাইতে পারিবে, এখনকার ভাব দেখিয়া তাহাতে আমার বিলক্ষণ ভরসা হইতেছে। কিন্তু তুমি আমার নিকট যদি এই সত্য কর যে আমি মরিয়া গেলেও তুমি কখন এস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে লইয়া অন্য দেশে যাইবে না এবং আমার কন্যা তোমার নিকট শতাপরাধী হইলেও তুমি প্রাণ থাকিতে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরী বা দেশান্তরী হইবে না, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার কন্যাটি প্রদান করিতে পারি।"

ব্যাধ-রূপী নারদ আপনার প্রাণাধিকা প্রিয়তমার সহিত চিরবাঞ্ছিত ও অব্যাহত প্রণয়-সম্বন্ধ যাবজ্জীবনের জন্য নিবন্ধ হইবার কথা শ্রবণ করিয়া এককালে আহ্লাদে জ্ঞান-শূন্য হইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপন পিতৃবৎ প্রতিপালকের নিকট ঐ সত্য অঙ্গীকার করিলেন।

ব্যাধ কহিল—"তবে তোমাদিগের বিবাহ হইয়াছে। আমি অনুমতি দিলাম, এক্ষণে তোমরা বনদেবতাকে সাক্ষী করিয়া স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় সংসার কর।"

নারদের আর সুখের সীমা নাই। নারদ যে কখন কি প্রকার সুখ সম্ভোগ করিবেন, তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারেন না। ক্রমে নারদের একটি সন্তান হওয়াতে তাঁহার অন্তরস্থ সুখ-সমীরণ আরো প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। নারদ দিন দিন পৃথিবীতে নূতন নূতন সুখ ভোগ করিয়া ইহাকে অবিচ্ছিন্ন আনন্দধাম বলিয়া মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন যায়; অনন্তর কালবশে একে একে সেই ব্যাধ-ব্যাধিনীর মৃত্যু হইল, এবং নারদ একেবারে নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। সংসারের সমস্ত ভারই একেবারে নারদের উপর পতিত হইল, এবং সেই ব্যাধ-ব্যাধিনীর মৃত্যুশোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে দুঃখাগ্নি-সঞ্চারেরও সূত্রপাত হইল। পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বদাই কেবল প্রসন্নভাবে ও প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রণয়িনীর প্রীতিভাব চিন্তা করিয়াই পরম সুখে কালক্ষেপ করিতেন, এক্ষণে আর নির্বিঘ্নে ও নির্বিবাদে সে প্রকার করিতে পারেন না। কখন আপনাদিগের সংসারের কর্ম্ম কার্য্য লইয়াও ব্যস্ত হইতে হয়, কখন পুত্রটির প্রতিপালন জন্যও উৎকণ্ঠিত হইতে হয়, এবং কখন আর আর প্রকার গৃহকার্য্য লইয়াও চিন্তাকুল হইতে হয়।

অনন্তর ক্রমে নারদের যত আরও দু-একটি সন্তান হইতে আরম্ভ হইল, ততই আরও পূর্ব্ব ভাবের অভাব হইতে লাগিল। তিনি একাকী বন হইতে পশু-হিংসা করিয়া

যে কিঞ্চিৎ জীবিকা উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগের সকলের সুন্দররূপে ভরণ-পোষণ হইয়া উঠে না, এবং সেই ব্যাধ-কন্যা একাকিনীও সকল সন্তানগুলিকে সুন্দর-রূপে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। ইহা সন্দর্শন করিয়া নারদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আর আপনার শরীরের প্রতি ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। কি প্রকারে সেই সন্তান-গুলির ও স্ত্রীর কষ্ট দূর হইবে, কেবল সেই চেষ্টাতেই তিনি দিবানিশি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গো-মহিষাদি ভারবাহী পশুর ন্যায় পরিশ্রম করিতেই রত থাকেন; কিন্তু তথাপি তাহাদিগের কষ্ট দূর করিতে পারেন না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েন।

নারদ মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিবাসী ও পরিচিত লোকের মধ্যে যাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিত, এবং যে সকল লোক নানা প্রকারে তাঁহার উপকার করিবার ভাব দেখাইত, অসময়ে তাহারা অবশ্য তাঁহার সহায়তা করিবে, এবং তাঁহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা পাইবে; কিন্তু তিনি যে সকল লোকের নিকট হইতে উপকার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার কোন প্রকার উপকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে অসমর্থ ও অনির্বিণ্ন দেখিয়া পাছে কোন উপকার করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার পথে চলাও রহিত করিল। কেবল বন্ধু-বান্ধবই কেন? তাঁহার যে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পূর্ব্বে তাঁহাকে জীবনের অপেক্ষাও অধিক যত্ন করিয়াও তৃপ্ত হইত না, সে-ও তাঁহাকে অসমর্থ ও অবসন্ন দেখিয়া ক্রমে অযত্ন প্রকাশ ও অপ্রিয় সম্ভাষ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দিন দিন নারদের যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা হইতে লাগিল।

নারদ এক-একবার মনে করেন, 'হায়! যাহাদিগের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের জন্য আমি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলাম, তাহারাই যখন আমার প্রতি এ প্রকার বিরূপ হইল, তখন আর আমার এ সংসারে থাকিয়াই বা কি ফল? এবং এ জীবন ধারণ করিয়াই বা আর কি প্রয়োজন? হয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হই, নয় অন্য কোন প্রকারে এ জীবনের শেষ করিয়া সকল দুঃখেরই অন্ত করি।"

কিন্তু নারদের এ সকল কল্পনা কেবল মনেতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার মনেতেই বিলীন হয়। নারদ প্রত্যহ রজনীতে চিন্তা করেন যে—কল্য মৃগয়ার্থ বন-গমন করিয়া আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, যেদিকে চক্ষু যায় অমনি সেই দিকেই গমন করিব; কিন্তু প্রতিদিনই মৃগয়ায় যাত্রা করিয়া পরিবারের মায়ায় পূর্ব্বমত পরিশ্রম করিয়া পশু-বধ করণান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং বার বার আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইয়া বার বারই তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন। পরিবারদিগের তিরস্কার ও লাঞ্ছনার যন্ত্রণায় তিনি সংসারের মধ্যে তিষ্ঠিতেও পারেন না এবং তাহাদিগের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সংসার ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতেও পারেন না। এইরূপে কিছু দিন যায়, একদিন রজনীতে ব্যাধ-কন্যা নারদকে কহিল—"তোমার হস্তে পড়িয়া আমি সকল প্রকার সুখ-ঐশ্বর্য্যই ভোগ করিলাম, কখন একদিন কোন স্থানান্তর একটু গিয়া জুড়াইতেও পাইলাম না। চিরদিন কেবল

এই সংসারের দুঃখ-চিন্তা ও কষ্ট লইয়াই জীবন গত হইল। শুনিতেছি, কল্য প্রাতে এখানকার সকল লোকেই গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিবে, কেবল এই কাল-সংসারের জন্য আমারই যাইবার উপায় নাই।"

ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া ব্যাধরূপী নারদ কহিলেন—"কেন, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমিও অনায়াসে গমন কর ; বরং আমি সন্তানগুলিকে লইয়া গৃহে থাকিব, এবং গৃহের সমস্ত কর্ম্মই করিয়া রাখিব।"

ব্যাধ-কন্যা কহিল—"না, যদি কল্য আমার গঙ্গা-স্নান যাওয়া তোমার অভিমত হয়, তবে তুমিও ছেলেগুলি ও আমাকে আপনার সঙ্গে করিয়া লইয়া চল।"

নারদ তাহাতে আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইলেন, এবং পর দিন প্রাতে তীর্থস্থানে যাত্রা করিলেন। নীচজাতি ব্যাধ দেখিয়া কেহ পাছে ঘৃণা ও অপমান করে, এই আশঙ্কায় নারদ সপরিবারে এক প্রান্তস্থ ঘাটে উপনীত হইলেন। সন্তানগুলিকে ক্রোড়, কক্ষ ও স্কন্ধ হইতে এক একে ভূমিতে নামাইলেন, এবং আপনি সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া গৃহিণীকে স্নান করিতে কহিলেন। ব্যাধ-কন্যা একে একে সকল সন্তানগুলির গাত্র মার্জ্জন ও অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া তীরে রাখিয়া আপনি স্নান করিতেছেন, এবং নারদ তটের উপর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ নদী হইতে প্রবল বেগে এক পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া সমস্ত তীর প্লাবিত করিল, এবং ব্যাধ-কন্যা ও তাহার সন্তানগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

ব্যাধ-কন্যা "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ আর্ত্তনাদ করাতে নারদের সেদিকে দৃষ্টিপাত হইয়া "হায় হায়, কি হলো! কি হলো! গেল, গেল," বলিয়া তিনি একেবারে শোকেতে জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই জলে লম্ফ প্রদান করেন। এমন সময়, ভগবান্ বিষ্ণু নারদের পশ্চাতে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তাঘাত করিয়া কহিলেন —"ও নারদ, কি নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ? আর কি তোমার ভগবৎ মায়া দেখিবার ইচ্ছা আছে?"

বিষ্ণু-হস্ত-স্পর্শে নারদ তৎক্ষণাৎ মায়ামুক্ত হইয়া আপনার পূর্ব্বের সমস্ত ভাব প্রাপ্ত হইলেন, এবং পূর্ব্বে যে মন্দাকিনীতে স্নান করিতে অবরোহণ করিয়াছিলেন, আপনাকে তৎ-তীরে দর্শন করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। নারদ চতুর্দ্দিক অবলোকনপূর্ব্বক কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া মনে মনে সকলই ভগবানের মায়ার কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন। এবং উদ্দেশ্যে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া দুই নেত্রে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করত কহিলেন, —"হে ভগবন্! আমি মূঢ় অজ্ঞান, আমাকে ক্ষমা কর। আর যেন কোন কালে আমাকে তোমার মায়ায় পতিত হইতে না হয়। আমি বুঝিলাম যে, যাহারা তোমায় মুগ্ধ হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহারা তোমার তত্ত্ব কিছুই জানে না।"

বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার

—প্যারী মিত্র

রঙ্গপুরের রামানন্দ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে কখন দর্শন করেন নাই, লোক মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জনক অমুক, সুতরাং সেই মত পরিচয় দিতেন। গ্রামস্থ ভাইপো সম্পর্কীয় কেহ কেহ ঐ কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন। রামানন্দের বিদ্যা শিক্ষা যৎ-সামান্য রূপ হইয়াছিল। বাল্যকালে লেখাপড়া করিতে বলিলে অমনি বলিয়া উঠিতেন, আমরা কুলীন লেখা পড়া কেন করিব? বুদ্ধি ও বিষয় না থাকাতে কৌলীন্যের গৌরবে গর্বিত হইতে লাগিলেন। মনে করিতেন, আমি যেখানে যাইব গুরুপুত্রের ন্যায় পূজ্য হইব—লোকে আমাকে টাকা দিতে পথ পাইবে না—বাস্তবিক সমস্ত বঙ্গভূমিই আমার জমিদারী—আমি এমন নিকশ কুলীন যে কশ না থাকিলেই আমার জন্য রস নির্গত হইবে,—আমি যদি দশটা খুন করি তাহাতেও আমার দণ্ড হইবেক না। রামানন্দ এইরূপে মনে মনে সদানন্দ হইয়া আত্মমানবৃদ্ধি জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া বেড়ান ও স্বীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্যকে অন্ধ দেখিলে বিজাতীয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন, আমি যে কি পদার্থ তাহা যে না চিনে সে বেটা হিন্দু নহে। গ্রামে ভদ্রাভদ্র লোকের বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তিনি ভবনে উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে যৎপরোনাস্তি সম্মান করে। কিন্তু কাহার বাটীতে আহারাদি করা দূরে থাকুক, নূতন ছিলিম গঙ্গাজল পুরিয়া না আনিয়া দিলে তামুক পর্য্যন্ত খান না। যদিও কালে ভদ্রে কাহার বাটীতে আহার করিতে সম্মত হয়েন, তথাপি কেবল অনাচমনীয় গ্রহণ করেন ও অপর লোক সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলেন—কি করি, আত্মীয়তা অনুরোধে বসিয়াছি, হিসাব মত শূদ্রের জলস্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পিরিতে কি না হয়? স্বয়ং রামচন্দ্র গুহচণ্ডালের বাটীতে কেমন করিয়া গিয়াছিলেন। যদি রামানন্দের কেবল এইরূপ ভণ্ডামি থাকিত, তাহা হইলে অন্যান্য লোকে চোকমট্‌কানি, গা টেপাটেপি, মুচুকেহাসি ও সময়ে সময়ে দুই একটা অম্বলমধুর ঠাট্টা করিয়া চুপচাপ রহিত, কিন্তু ভণ্ডামির সহিত ষণ্ডামি থাকাতে আপামরসাধারণ লোকে তাহার কথা সর্ব্বদা আন্দোলন করিত। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল, সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহার গুণাগুণ প্রকাশ হইতে লাগিল।

রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে একজন সপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবাবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়াছিলেন, তথায় ধ্রুব মহাশয়ের ন্যায় গহন বনে কঠোর

তপস্যার্থ না গিয়া মাতামহ দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা মকর্দ্দমা ডিগ্রি ডিসমিস করত কি জাত্যাভিমান কি পরদারিত্ব কি বলবিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে "পদ্মপলাশ-লোচন" আমার হাতের ভিতরে। আপন বিষয়ের মধ্যে কেবল বিগে কত জমি—হাজা শুখা না হইলে মাস কয়েকের ধান্যের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অন্যান্য খরচ কেবল মুখভারতীতে নির্ব্বাহ হইত। প্রতি দিন বাজারে গিয়া তোলা তুলিতেন ও জিনিষের নমুনা চাই বলিয়া কোন কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় অথবা ব্যবহার করিতেন। যদি কোন উঠ্‌নাওয়ালা টাকার তাগাদা করিতে আসিত, তবে তাহার গলায় পইতাটা ও মস্তকে পায়ের ধূলা দিয়া বলিতেন—আমি লোকটা কে জান ? আমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। উঠ্‌নাওয়ালা বলিত—মহাশয় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তানই হও আর কৃষ্ণঠাকুরের সন্তানই হও আমরা দুঃখী মানুষ, উঠনা খেয়েছ, এত তাড়াতাড়ি কর কেন ? অন্যান্য লোকের নিকট জিনিষপত্রটা চাহিয়া আনিয়া বন্ধক অথবা বিক্রয় করিতেন। তাহারা চাইতে পাঠাইলে রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, ভাল—দেওয়া যাবে, এত ব্যস্ত কেন, আমি কি জিনিষ লইয়া খেয়ে ফেল্‌লুম ? এ প্রকারে অনেকের ঘটাটা বাটীটা তাওয়াখানা ধুতি চাদর রেজাই সাল রুমাল দেখিতে দেখিতে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দোকানি পসারিরা তাহাকে দূর থেকে দেখিলেভয়ে ঝাঁপ বন্ধ করিত। কিছু কাল এইরূপে কাটাইয়া তিনি গুরুমহাশয়গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিকট হইতে পরব পার্ব্বণে পয়সা ও দ্রব্যাদি লইতে ক্রটি করেন নাই, কিন্তু পড়াইবার সময় হইলে যুক্তাক্ষর শব্দের অর্থ অথবা কসা-মাজাতে ভারি বিপত্তি হইত। পরে আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইলে পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু কাল বেত হাতে করিয়া ঢুলিতেই মশা তাড়াইয়া ছিলেন। পিতা-পিতামহের ন্যায় স্থানে স্থানে বিবাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করিবেন এই মানসে পাণি গ্রহণ করিতে কসুর করেন নাই, কিন্তু সে পাণি গ্রহণে বাস্তবিক পাণি গ্রহণই হয় নাই। যেখানে যাইতেন সেখানেই তাহার রাত্রিবাস লাভ করণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলেই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত। তাঁহার বাটীর নিকটে ভজহরি ঘোষ নামে একজন প্রকৃত মুখী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক পুরশ্চারণ উপবাস ব্রত নিয়মে নিযুক্ত থাকিতেন, ও কুলশীলের কথা লইয়া নিকটস্থ লোক সকলকে উপদেশ দিতেন। কে কনিষ্ঠ, কে ছতায়া, কে মধ্যাংশ, কে মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো, কাহার পান দোষ, কাহার পশ্চাৎ দোষ, কাহার দেবীদাস দোষ, কাহার গঙ্গাদাসী দোষ, কে উলই, কে সহজ, কে কোমল, কাহার আঙ্গিরসের ঘর, কে গোষ্ঠিপতি, এই সকল কথা লইয়া বিতণ্ডা করিতেন। ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে ছাপ, গায়ে নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, দৃষ্টি মাত্রে বোধ হইত, তিনি বড় শুদ্ধচিত্ত লোক, কিন্তু গ্রামের যাবতীয় গল্‌তি কর্ম্মে সংগোপনে মূলীভূত থাকিতেন। দালানে আহ্নিক করতে সিলে নিকটে নানা প্রকার মন্দ লোক আসিত। আহ্নিক করিবার সময়ে অপর লোক থাকিনি ক্রমে পরামর্শ দিতেন নতুবা তাহাদিগের কাণে কাণে গুরুমন্ত্র প্রদান করিতেদিলো।ভিক্ষব

কেহ ধরা পড়িত অথবা কোন মামলায় দারোগা সুরৎহাল করিতে আসিত, তিনি জিজ্ঞাসিত হইলে মালা জপিতে জপিতে বলিতেন, আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না—আমি উদাসী, কেবল গোবিন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করি। এখন তোমরা এই আশীর্ব্বাদ কর যে, ভবনদী পার হয়ে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাই আর যেন আমাকে জন্ম গ্রহণ না করিতে হয়। এ সব কথা যাহারা শুনিত তাহাদিগের এই বিশ্বাস হইত যে, ঘোষজ সাংসারিক বিষয়ে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন, কেবল পারমার্থিক বিষয়ে আসক্ত। রামানন্দের সহিত ভজহরির ক্রমশঃ বিজাতীয় আত্মীয়তা জন্মিল। দুই জন দুই জাতির টেক্কা কুলীন—দুইজনেরই জাত্যভিমান অসাধারণ—দুই জনেই কপট ভণ্ড ও বিটল—দুই জনেই ধনলোভী—দুই জনেরই অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, সুতরাং এত ঐক্যতায় আত্মীয়তা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে, কি ফেরেবে, কি পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপথ দেওয়াতে দুই জনেই বিলক্ষণ পটু, কিন্তু এমন বর্ণচোরা আঁবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করে। পরন্তু গ্রামের যাবতীয় লোক ক্রমে ক্রমে টের পাইতে লাগিল। রামানন্দ ষণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ভজহরির সহবাসে এক্ষণে অন্তঃসলিলা বহিতে আরম্ভ করিল। দুই জনেই অন্যান্য লোকের সমীপে কেবল কৌলীন্য গৌরবে ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মাহাত্ম্য আন্দোলন করেন, এবং অশেষ বিশেষ রূপে ইহা প্রকাশ করেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদিগের কিছু মাত্র অনুরাগ নাই। তাহাদিগের সচল বচল দেখিয়া আপামর সাধারণ লোকের আরো সন্দেহ জন্মিল ও ঐ মহাত্মাদ্বয়ের বিষয় বিভব বৃদ্ধি হওয়াতে কুমতির বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নদীতীরে কয়েক ঘর ডোম বাস করিত। রামপ্রসাদ নামে একজন ডোম আপন পরিবার রাখিয়া বিদেশে গমন করিয়াছিল। তাহার পত্নী প্রাতে মজুরি করিতে যাইত। হয় তো দুই তিন দিবস কর্ম্মক্রমে বাটী আসিত না। তাহার এক পরমাসুন্দরী বিধবা কন্যা গৃহে থাকিয়া কাটনা অথবা পাট কাটিত। সে প্রায় লোকালয়ে বাহির হইত না ও পুরুষ মাত্র দেখিলে সকলকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিত। আপন বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিত ও পিতামাতাকে কি প্রকারে সুখী করিবে তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করিত। রামানন্দ ও ভজহরি ঐ যুবতী কন্যাকে কুপথগামিনী করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা ঐ প্রস্তাবকে কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন—আমি নীচ জাতি—যখন পতির বিয়োগ হইয়াছে তখন আমার সংসারের সকল সুখ ঘুচিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইতেছি—প্রাণ সত্ত্বে সতীত্ব ছাড়া হইব না—আমাকে ধনলোভ দেখান বৃথা—আমি প্রতিদিন পরমেশ্বরকে বলি প্রভু! আমি অনাহারে মরি সেও ভাল যেন শুদ্ধ চিত্তে ও পবিত্র শরীরে তোমার চরণ ভাবিতে ভাবিতে মরি। এই কথা রামানন্দ ও ভজহরি শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য করত যুক্তি করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর অন্ধকার—মেঘগর্জ্জন করিতেছে—বিদ্যুত চমকিতেছে—বজ্র ঝণ ঝণ শব্দ করিতেছে। নদীর জল তোলপাড় হইতেছে, নিকটস্থ এক একটা গাছের উপর নানা জাতি

পক্ষী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে—ডোংগাড়েরা টোকা মাথায় দিয়া তামুক খাইতে খাইতে বলিতেছে "সালার বাদল বড় করিলে।" ডোম কন্যা মাতার অনাগমনে অসুখী হইয়া পিতাকে স্মরণ করত আত্ম দুরবস্থায় কাতর হইয়া স্বামীর প্রিয়বাক্য মনে করিতেছে ও এক এক বার নয়নবারি অঞ্চল দিয়া মোচন করিতেছে। গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের শব্দে চমকিয়া দেখিল, দুই জন চোয়াড় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, বাবা তোরা কে? আমাকে কেন ধরিস? চোয়াড়েরা তাঁহার বাক্যে একটু বিমোহিত হইয়া থমকিয়া পরে পরস্পর মুখাবলোকন করত কিছু উত্তর না করিয়া, ধরিয়া লইয়া চলিল। ডোমকন্যা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে নিকটস্থ স্বজাতীয়দিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহারা সকলে আস্তেব্যস্তে দৌড়িয়া আসিয়া দুইটা চোয়াড়কে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিল ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া সকলে ঘিরিয়া রহিল। কন্যা উদ্ধৃত হওনকালীন বলিলেন, যাহারা আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাদিগের বিচার পরমেশ্বর করিবেন।

দৈবাৎ রামপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই পরদিন প্রত্যাগমন করিয়া আপনাদিগের দুঃখিনী কন্যার সকল কথা অবগত হইল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত বলবান ও সাহসী, আপন রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রামানন্দ ও ভজহরির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরি চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে হাত পুছিতেছেন ও রামানন্দ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত ফুস ফুস করিয়া মালা জপিতেছেন। রামপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের দুই জনের চুলের টিকি ধারণ পূর্ব্বক জুতার চোটে পিট রক্তিমাবর্ণ করিয়া দিল। নিকটে দুই চার জন দরয়ান ছিল তাহারা রামপ্রসাদকে ব্যাঘ্ররূপ দেখিতে লাগিল ও আত্ম রক্ষার্থে অন্তরে পলায়ন করিল। গ্রামের ছেলে বুড়া যুবক, যাবতীয় লোক প্রফুল্ল বদনে বলিল—ভাল মোর বাপ রামপ্রসাদ, এত দিনের পর কুলীন মহাশয়দিগের কুল রক্ষা হইল।

লোকের যখন দুর্গতি হয়, তখন নানা প্রকারেই হইয়া থাকে, একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে নদীর তোড়ের ন্যায় অচিরাৎ সব ধস্কে দেয়। রামপ্রসাদি পদের পর রামানন্দ ও ভজহরি কোন প্রসাদ অন্বেষণ না করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিলেন, কিন্তু তাহাদিগের কর্ত্তৃক চুপচুপি গল্তি কর্ম্ম সমুদ্র বিশেষ—তাহার অসীম নদ নদী স্রোত ঝিল খাল সোঁত চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, কখন কাহার বাঁধ ভেঙ্গে উপপ্লাবন করে, তাহা অতিশয় অনিশ্চয়। উক্ত দুই কুলীন মহাত্মার এমত ক্ষমতা ছিল না যে, অগস্ত্যের মত এক গণ্ডূষেই উদরস্থ করেন, অথবা পশুপতির ন্যায় জটাজুটের ভিতরে রাখেন। দেখিতে দেখিতে একটা জাল মকদ্দমায় তাহাদিগের বেনাকরি প্রমাণ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়া চালান হইলেন। ঐ সময়ে এক জন ঢুলি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একটু আহ্লাদিত হইয়া দক্ষে হাত নেড়ে নেড়ে বাজাইতে লাগিল "জামাই ভাত খেসে রে, তোর শ্বশুর নাই ঘরে" ও মল্লেশ্বরপুরের ঠাকুর সুপণ্ডিত রমাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, তোমরা তো চলিলে, এক্ষণে কি লইয়ে যাবে? বিস্তর ভোগ কর্‌লে—বিস্তর ভোগ করালে, এক্ষণে কর্ম্মভোগ কে নিবারণ

করিতে পারে? তোমরা যে তপ জপ করিয়াছ তাহাতে বোধ হয়, আর ফিরিয়া আসিতে হবে না—ওগো তোমরা প্রকৃত মানুষ নও, তোমরা বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

—দীনবন্ধু মিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদা নিদাঘ কালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান মরীচিমালীর প্রখর করনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন।

নিরয়াধিপতির পুরোভাগে অশীতিহস্ত পরিমাণ আশীবিষ সদৃশ্য বক্র নল সঙ্কুল আলবলা, তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দ্বারা রাজমহলসমুদ্ভূত তামাক নিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, "অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?" প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন, অদ্যাপি ও কোম্পানির ষ্টীমারে ভীয়া ব্রিণ্ডিসি এক খানি সরকারি চিটি এবং সমীরণ যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই, জরুরি, শব্দাঙ্কিত।

রাজার অনুমতি অনুসারে মুন্সিপ্রবর সরকারি লিপি খানি অগ্রে পাঠ করিলেন, যথা—

"মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীলশ্রীযুক্ত সংহারনিরত মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজ যমরাজ মহোদয় অপ্রতিহত প্রতাপেষু,

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় হইয়া সৈন্যবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণপূর্ব্বক বসন্তঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, স্ত্রী পুরুষ ধনী, দীন, শিশু, স্থবির, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান, আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেন্ট আমার অমিততেজ অভিভূত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্য "কৃষ্ণ" দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। কলিকাতার একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সসৈন্য দিগ্বিজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইষ্টইণ্ডিয়া এবং ইষ্টার্ণবেঙ্গল রেলের দুই পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ সম্পূর্ণ

অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অস্মাদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। পঞ্জাবাধিপতি অজাতশত্রু রণজিত ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রক্তবর্ণে চিত্রিত গুলিন কাহাদের অধিকার?' প্রত্যুত্তরে জানিলেন ইংরাজদিগের। তখন তিনি বলিলেন, 'সব লাল হো যাগা'— রণজিতের এতদ্বিষয়াস্থাণী মদীয় দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রয়োক্তব্য।

যমালয়ের কারাগারে স্থানাভাব বলিয়া আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ শ্রাবণ।

একান্তবশম্বদ
শ্রীডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।"

লিপির মর্ম্মাবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেংগুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে তাঁহার বীরকীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অদ্যাপি ডেংগুচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি তাহারা শীতাগমনের পূর্ব্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কৃষ্ণ" চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত দূর প্রদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা;–

"দুষ্ট দমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ মহোদয়।

অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু। গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগেরহাট সবডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা, গড়গোয়ালা, দেসোয়ালী, জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি লোক হত হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল একজনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুর্য্যে একজন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায় মাতাটি দোফাক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত করিল যে আপনকার দূতেরা এবং আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস ইনস্‌পেক্টরের লোকেরা তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারিবাড়ীর বড় আটচালার

পশ্চিম পার্শ্বের কাম্‌রায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি এক পাটায় ঢাকা আছে। যদি পত্রপাঠ দূত প্রেরণ করেন, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল আপনার পুলিসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলাম। ইতি।"

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপর নাই উৎকলিকাকুল হইলেন। চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। না জানি, কি সর্ব্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য হইবামাত্র আমার অধীন; কিন্তু আশ্চর্য্য ধূর্ত্ত জমীদার কর্ম্মচারীরা দিবসত্রয় পর্য্যন্ত অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রবল ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন? এক সেট্ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দাও যেন এই রজনীমধ্যে নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন করে—তাহারা যদি পিতা মহাশয়ের গাত্রোত্থান করিবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা আধুলি দিব।" আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র চিত্রগুপ্ত আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার পার্শ্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নায়েব রক্ষিত হওনের পর পতন বাবুর কর্ম্মকারকেরা জানিতে পারিলেন, তৎসংবাদ পুলিসের সব্-ইনস্পেক্টার জ্ঞাত হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাসটি স্থানান্তরিত করিল চারপায়াখানি খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগনার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর, মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক। তাহাতে দুইটি তাম্র মাদুলি; ললাট প্রশস্ত মধ্যস্থলে দড়্‌কা রোগ সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয়, রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র কিন্তু জ্যোতিহীন নহে, নাসিকাটি লম্বা অল্প মঙ্গোলীয়ানকট্ বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়। উদরটি স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়।

রামনাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি দূর মানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়া খানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন।

কুড়রাম অল্পকাল মধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, তাললয়বিশুদ্ধ ফরর্-ফরর্ ফরাৎ ফরর্-ফরর্ ফরাৎ নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজ প্রেরিত বাহকগণ এমত সময়ে আটচালায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল। এমত সময়ে কুড়রাম আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া খাটাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। যমরাজের সৌধ সমীপে ঝাউ গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারিতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুমি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাটিয়াল বা সুড়কিওয়ালা কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল আটজন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটি চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচণ্ড চড় মারিয়া তর্জন গর্জন সহকারে কহিলেন– "ওরে নচ্ছার বেটারা প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার নিকট আর আসিস না, আমি পতনবাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরীকে ভয় করি? এইদণ্ডে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডব দহন করিয়া যাইব, আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, এক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের মুণ্ডপাত করিব।"

আটজন বেহারার মধ্যে তিনজন ভয়ঙ্কর সজীব চরের প্রভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বৈতরণী নদী গর্ভে পড়িয়া গেল, তিনজন কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল, একজন উর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, একজন খট্টাঙ্গ সমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন, "একি ভীষণ ব্যাপার, কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন।" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল, "মশাইগো, এটা চৌধুরীদের কাছারীবাড়ী নয়, এটা যমপুরী। মোরা নব ঠাকুরকে আন্তি গিয়েনাম, তা ভুল করে তোমারে এনে ফেলিচি, মারামারি করিবেন না, আর মোরে যা বল্‌বেন তাই করবো।"

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগচ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং দুই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটি দিয়া কহিলেন, আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চল। বেহারা যে আজ্ঞা বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাত কার্য্য সম্পাদন করান্তর কৃতান্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল চিত্তে বাহকগনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত্ত বাহক অতিবেগে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, "কত্তামশাই, পেলুয়ে যাও, পেলুয়ে যাও আর অক্ষে নেই, মাল্যে, মাল্যে, বৈতরণীর ধারে একজন বীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত কর্‌বে, এক চড়ে আটা কাহার ঘাল করেছে।" চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাস আনিয়াছিস কিনা?" বেহারা কহিল, "নবঠাকুরকে কনে নুকয়েচে তার অন্দি সন্দি পালাম না, মোদের কাঁদে একটা নতুন যম এসে পড়েছে।" যম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নুতন যমকে পাঠালে কে?" বেহারা বলিল, "সে আপনি এয়েচে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে

কুড়রাম তাঁহার বাক্স বাহক সমভিব্যাহারে যমরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন, যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন, যথা;–

"ইজ্যতাছার শ্রীযমালয়াধিপতি কৃতান্ত মালম করিবা শ্রীসদাশিব।

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্ব্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্ব্বতন, অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ, রণ্ডামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, তোমার দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্ম্মণ্য, জমীদারের কয়েকজন অল্প বেতন ভোগী আমলা তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্তবাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।"

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দত্তজ মহাশয় কখন্ কার্য্য লইবেন?" দত্তজ উত্তর দিলেন, "এই দণ্ডে।" চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্যের কাগচ পত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পারিষদ বর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্ত্তিবিস্ফারিত বদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটি জমাওয়াশীল বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজালানির দাম বাকি আছে, সে গুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি রাহা খরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি;" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি এবিষয় ভগবান্ ভবানীপতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।" পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে যে বয়ারদ্বয় আছে, তাহার একটি সরকারি আর একটি আমার নিজ খরিদ, যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটি আমি লইয়া যাই।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "তুমি দুইটি লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চৌধুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।" পুরাতন যম প্রস্থান করিলে নতুন যম সভা ভঙ্গ করিয়া সহর পরিদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।

যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ, আফিসজান বা ব্রাউনবেরি চলিবার উপযোগী নহে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহিষারোহণে গমনাগমন করেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জিনিয়ার দিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন, এক ঘন্টার মধ্যে সমুদায় রাস্তা পরিসর এবং সুমার্জিত হইবে অন্যথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন করিবেন। চিত্রগুপ্ত কহিলেন

"ধর্ম্মরাজ! রাস্তা চৌড়া করিতে গেলে অনেক বড় মানুষের বাড়ী পড়িবে, সে সমুদায়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একজন ডেপুটিকালেক্টরের প্রয়োজন, এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সরভেয়িং জানেন না।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি সরভেয়িং পারদর্শী একজন ডেপুটিকে আনাইয়া দিতেছি।" যমালয়ের বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া কুড়রাম যার পর নাই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কারণ ছাত্রেরা জমাওয়াসিলবাকী লিখিতে জানে না এবং কবিওয়ালাদের গীতও বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্বিদ্যাদ্বয়োন্নতিসাধক দুইটি নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ধনাগার, কারাগার, হাঁসপাতাল, পাগলাগারদ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গাত্রলোম আর প্রত্যক্ষ্য হয় না, শিবের মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা বাজিতে লাগিল, বৈতরণী তীরে ঋত্বিক মণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কুড়রাম রাজাট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চিরজীবিনী এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ রাজমহিষী কালিন্দীও সেইরূপ তবে শচীর রূপ দেখিলে মনে আনন্দোদ্ভব হয়, কালিন্দীরূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। যে যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারি রাণী; যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারি রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী, তাহার উদর পরিধি চতুর্দ্দশগজ দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি; হস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং চিবি যুগলে বিভক্ত, সীমন্তে সাত হাত লম্বা, দুই হাত চৌড়া, আদ হাত উর্দ্ধ সিন্দূর রেখা, ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত; নাসিকা নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ, তাহাতে একটি নত দুলিতেছে, নতটি কুম্ভকারচক্র পরিমাণ মোটা, লোলকটি যেন একটি কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটি সুপক্ক বিলাতি কুমড়া বিশেষ; দাঁতগুলিন দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠ দ্বারা ঢাকা পড়ে না; জিহ্বাটি গোজিহ্বা, হাত দিলে কর কর করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে; কালিন্দীর ত্বক মসৃণ নহে, হাতির গায়ের মত খস খসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশ বিন্যাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাশী খান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে এক খান চুনুরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আদমণ সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল; প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে মুখামৃত সহযোগে অভ্র খণ্ড সমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদযুগলে বাইশ গাছা মল। ঘু ঘু ঘড়িতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণ পূর্ব্বক ঝম্ ঝম্ করিয়া অপরিচিত স্বামিসন্নিধানে গমন করিলেন।

শয়ন মন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণ সংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, "যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া পড়িবে।" শয়নাগারে অস্লারের বাড়ীর ঝাড় জ্বলিতেছে! শয্যার নিকটে কয়েক খানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং

চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁত গুলিন বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন "কল্যাণি, তুমি কে?" কালিন্দী বলিল, আমি যমরাজ-রাজমহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্ম্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।" কুড়রাম ভাবিলেন, "এই বারে গেলেম, যদিও দুই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ মূর্ত্তি দর্শনে আর থাকিতে পারি না, মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, কি কৌশলে ও রক্তবীজবিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; গৃহিণীর জ্বালায় গৃহ ত্যাগ করিতে হইল, স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল। কালিন্দী কুড়রামকে দুর্ম্মণায়মাণ দেখিয়া কহিলেন, "প্রাণ বল্লভ, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি প্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি ষাঁড় আমি গাই,
তুমি হাতা আমি ছাই,
তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ি,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ি,
তুমি বোল্‌তা আমি চাক্,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক,
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি দুল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী,
তুমি মিন্সে আমি মাগী,
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি,
তুমি বাঁশ আমি ডুলি,
তুমি ডালা আমি ডালি
তুমি শালা আমি শালী।"

রাজ্ঞীর মুখভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একটু চড়্‌কে হাসি হাসিয়া বলিলেন "শোভনে! তোমার বচনপীযূষে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ফলে তোমা হেন স্থূলোদরা দারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, কিন্ত হরিষে বিষাদ, আমার গণিভূত যক্ষ্মাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্ম্মিণী সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চারুহাসিনি, দিবসত্রয় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।" কালিন্দী একটি পানের খিলি কুড়রামের মুখে দিয়া বিষাদিত মনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলিটি চর্ব্বণ করিবামাত্র হড় হড় করিয়া কুড়রামের অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া

পড়িল। ভাঁটপাতা, নিম, মাচের আঁশ, কুইনাইন রাজমহিষীর প্রিয় পানের মশলা, স্বামিবশীভূত করণাশায় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলিতে দিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদাপ্রদত্ত পানের খিলি আর না খুলিয়া খাইবেন না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। স্ত্রীর মুখ মনে পড়াতে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদচ্যুত যম বিষণ্ণ বদনে ভবনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদয় পরিচয় দিলেন। যমরাজ জননী যার পর নাই দুঃখিত হইলেন ; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, "বাবা যম, এদুর্ভিক্ষ সময়ে তোমার কর্ম্মটি গেল, এ রাবণের পুরী কি প্রকারে প্রতিপালন করিবে তুমি। আহার কর, তারপরে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজকাল অঞ্চলপ্রভাব অতীব প্রবল।" যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বসা মাত্র, একটি ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন। কহিলেন, "ভয় কি বাবা, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এতকালের কর্ম্ম কখনই একবারে ছাড়াইয়া দিবে না। বিশেষ লক্ষ্মী ঠাকরুণ অনুরোধ করিলে কেহই বক্রভাব প্রকাশ করিবেন না, আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায়, বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করিবে। তোমার হাতযশ সকলেই অবগত আছেন, আর আমি অনেক শিল্পকার্য্য জানি, জুতা টুপি মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহায্য করিব।" জননীর সাহস বাক্যে যমরাজের দুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন সমাপন করিয়া উড়ানি খানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠনঠনের জুতা যোড়াটি পায় দিলেন, তার পরে এক গাছ্ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসান। লক্ষ্মী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, স্বভাবতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অঙ্গে অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে দুগাছি হীরক বলয়, পায়ে চার গাছি জলতরঙ্গ মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোনার গোট, কণ্ঠে দুনর মুক্তামালা, মস্তকে সজল জলদরুচি উজ্জ্বল কেশদামে ফিরিঙ্গি খোঁপা বাঁধা, কর্ণে কাঁচপোকা ঝুলতুল্য দোদুল্য নীল পান্না। ছাঁচি পানে সুমধুর অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুকটুক করিতেছে। একখানি রেলওয়ে পেড়ে সিমলার ধোপদস্ত ফিনফিনে ধুতি পরিধান, তাহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষ্মী দুর্গেশনন্দিনী অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অধীয়মান পত্রে প্রদর্শনী প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুড়িয়া আয়েসার বিষাদ আলোচনা করিতেছেন। এমত সময় যমরাজজননী সমুপস্থিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজজননী

আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মা, আপনি ত্রিলোক প্রতিপালিনী ; আমার যমের প্রতি একটু দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদখানি হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা যমের কর্ম্ম গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না, তা বাছা, তুমি আর রোদন করিও না আমি ঠাকুরকে বলিয়া যত দূর পারি, তোমার উপকার করিব।" যমরাজজননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা, আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক, মা আপনি মনে করিলে সকলি করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে কদিন বাঁচি, আপনার কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।" লক্ষ্মী কহিলেন, "বাছা, আমার অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" যমরাজজননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরিচারিকাকে কহিলেন, "বিন্দি, ঠাকুরকে এক বার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

বিষ্ণু সম্প্রতি একটি গরুড়ের জুড়ি কিনিয়াছিলেন ; পক্ষিদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত একবার ওহো বেটা ওহো ও বেটা বলিয়া গাত্রে হস্ত নিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগদ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বক্রগ্রীবা অবলোকন করিতেছেন, এমত সময়ে বিন্দি আসিয়া উপরআদালতে সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড়প্রিয়, ওয়ারেন্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দির অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটি আদরগর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, "আসামী হাজির, দণ্ড বিধান করুন।" নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ রোষ-কসায়িত লোচনে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।" বিষ্ণু কহিলেন, "এখন তোমার প্রার্থনা কি ?"

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা ?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন ?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছি।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সদাশিব যমের কর্ম্ম ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটি তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে, যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল, আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।" বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সেকি, সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক যখন তুমি তাহার ওকালত নামা স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। লক্ষ্মীর অলককুন্তলে একটি দোল দিয়া বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর অভিমতানুসারে কোচম্যান বিস্মার্ক ব্রাউন ভারর্ণর ফিটানে নূতন গরুড়ের জুড়ি যোজনা করিলে নারায়ণ আরোহণপূর্ব্বক পদ্মযোনির সপ্তসরোবরোদ্যানে যাইতে কহিলেন। ব্রহ্মা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচ্যুত পরোয়ানা খানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচবক্সে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ি ছুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের স্বাক্ষরের প্রতি তাঁহার এক বার সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়িও সপ্তসরোবরোদ্যানে পৌঁছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ব্রহ্মার তদবস্থাদর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "মহাশয়, প্রণাম হই।" ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সম্মান সহকারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবাজি যে অসময়?" বিষ্ণু কহিলেন, "বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আপনার বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইবার বিলম্ব কি? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ভয় হয়।" ব্রহ্মা কহিলেন, "সেকি বাবাজি, আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের প্রারম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।" বিষ্ণুর পশ্চাৎ যমকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "অকালে কালের আগমন; অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে নাকি?" বিষ্ণু কহিলেন, "যমরাজ মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব যমকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই

পরোয়ানা খানি পাঠ করুন।" ব্রহ্মা পরোয়ানার মর্ম্মাগত হইয়া বলিলেন, "যমের এ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীরু যে পর-শ্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুর স্বভাব মহোদয়-গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্যশৈথিল্য, সদাশিবের তো দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।" বিষ্ণু কহিলেন, যম আপনার সন্তান; সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তানুগত, বহুকালের চাকর উহাকে একবারে পদচ্যুত করা বিচার সংগত হয় না।" যমরাজ করযোড় করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "ভগবন চতুর্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।" ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবাজির অভিপ্রায় কি?" দয়াপয়োধি সহৃদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, "মার্জ্জনা কর।" ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বর ভবনে যাইবার জন্য বিষ্ণু অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, "ফিটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচমিনিটে আসিবে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বাবাজি, অদ্য বেলা-বসান হইয়াছে, গমন প্রত্যাগমনে রাত্রি হইবে বিশেষ সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার। আপনার তো অবিদিত কিছুই নাই, অতএব যমকে অদ্য বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আটটা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে যাইবেন।" যম ব্রহ্মা বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজি, আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না, শচীনাথ টড়হিট্‌লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার অনাগমনে তাহা খোলা হয় নাই।" ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে আটটা বাজিবার পাঁচ মিনিট বাকি আছে, মহাদেব স্বীয় কক্ষা-ভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দূল চর্ম্মোপরি উপবিষ্ট; দুই হস্তে কমণ্ডলু ধরিয়া গরম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্বে বিরাজিতা, শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার করশাখা দ্বারা শশাঙ্কশেখরের পৃষ্ঠ দেশের ঘামাচি মারিয়াছেন। গত রজনীতে শূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধি শিবের মৌতাত, তবে অচেতন হইবার কারণ কি? নন্দী নূতন বাজারে গাঁজা কিনিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন, ব্রাণ্ডীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্ব্বদাই ভর্ৎসনা করেন। গত নিশিতে নন্দী ষাঁড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জ্জটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ ব্রেভো নন্দী বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অম্বিকার সঙ্গে চলে

পড়িলেন। বমন প্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্ব্বতী পতিপ্রাণা এবং ঘৃণাশীলা; অবিলম্বে কলুষিত শয্যা স্থানান্তরিত করিয়া অভিনব শয্যা রচনাপূর্বক শব্দহীন পিনাকপাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং খিড়কির পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটি আপাদ মস্তক গগ্‌নেলের সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আইলেন। গৃহে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিত, নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পাচিকাকে বল সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাচের ঝোল দিয়া চারটি ভাত দেয়।" ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনত মুখী হইলেন, শিব কহিলেন, "ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কিসে?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধি রস্ত অ আ হইয়াছিল, সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও তো আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ, কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা হাসির মার বড় মার, অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কত প্রদান কর, দেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়। ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবতী বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্ট প্রহর আমার সহিত ঐ রূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁহার চরণসেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?" মহাদেব কহিলেন, "না হে চতুর্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।" ভগবতী কহিলেন, "তবে নখরে নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।" বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভগবতী, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা, তাহার কাছে যাও।" ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যম এমন ম্রিয়মাণ কেন?" ব্রহ্মা কহিলেন, "আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তরু শুষ্ক হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অনুগত, উহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে,

আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী ; আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎ সাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। আপনার অনুজ্ঞা অস্মাদাদির নিকটে অখণ্ড বলিয়া পরিগণিত ; আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকাল স্থায়ী, আপনার দয়া মারুরিভ চিরপ্রবাহিত ; অতএব হে বদান্যতা-বারাংনিধি বগলাবল্লভ ! অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয় গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয়মাত্র সমুদ্ভূত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা এবং প্রস্রাব হয়, কিন্তু অদ্য জানিলাম, একটি চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সেটি প্রলাপ। আমি যমের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই, আপনি কহিতেছেন, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন দিন বলিবেন, আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।" ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ "সদাশিব স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানা খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, "এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটি আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা ছিল না।" যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; "তুমি কি চার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছ ?" যম উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই, এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর নিকেতনে গমন করিতে হইবে।" বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল যম, কুড়রামের সমভিব্যাহারে সৈন্যসামন্ত কত আসিয়াছে ?" যম উত্তর দিলেন, "জনপ্রাণী না, কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি কৃষ্ণাবতারে কংসালয়ে হাতে মাতা কাটিয়াছিলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েক জন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।" বিষ্ণুর মতে বহ্বারম্ভ অপ্র-য়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন অমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা রকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেসিয়াল ট্রেনে যমের সম-ভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত অভিবাদন

করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের কারাগারগুলিন প্রশস্ত না করিলে বন্দীগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটি কারাগার করিবার আবশ্যক হইবে।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "এমন উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্দ্বারা কারাগার প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। তুমি ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃঙ্খল দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দেখিবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া আছে।" চিত্রগুপ্ত সঙ্কুচিত চিত্তে কুড়রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে সে নিযুক্ত, তাহার কারাবাসা-নুজ্ঞা আপিলে খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা। চিত্রগুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল এবং বাক্সের উপর সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল, তোমাকে যে হুকুম দিতেছি, তুমি তাহা তামিল কর, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। কুড়রাম কম্পিত হস্তে রায় লিখিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?" কুড়রাম উত্তর দিলেন "প্রভো, আমি লোচনপুর কাছারির আট-চালায় শয়ন করিয়াছিলাম, যমপ্রেরিত বাহকগণ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিল। আমি এখানে পৌছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায় সম্পত্তি হীন, কি করি, অবশেষে কাগজ কলম লইয়া এক খানি পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনে হুজুরের নামটী জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে, বিশেষ 'ধ্যায়েন্নিত্যাং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং' ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখরনীলকণ্ঠ! দক্ষযজ্ঞবিনাশন-মার্জ্জনীয়মহেশ্বর! অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন "বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তর স্বরূপ তোমার লোচনপুরের কাছারি বাড়ীতে পৌছাইয়া দিই।"

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে তো? নাকে কানে খত দাও আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না।" যমকে ভর্ৎসনা করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রা ভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চারপায়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন।

দামিনী

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুকাল হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল "আয়ি! আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধা মাতামহী ব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিলনা; সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথমে দীপ ভাসাইল; দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না; অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল না; কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

নদী প্রশস্ত; অন্ধকারে সেই নদী আবার গভীর এবং অকূল বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে, এক্ষণে আর উপায় নাই ; অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীরভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল; দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল। শয়ন মাত্রেই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন মেঘ অন্ধকারে ভারি হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল, এমত সময় পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপর গম্ভীর ভাবে একটি বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল; সেইটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী তৎ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিত, কখন পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল।

বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঙ্কুল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াদিলেন। দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কি" বলিয়া নিদ্রিতা দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রাভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না; তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পর দিবস প্রাতে দ্বাদশ বর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায় যাইতেছিল; দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া পক্ষীশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর হইয়াছে কি? দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলিল আয়ীর উপর রাগ করিয়াছ? দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রাগ্র হইতে কথক গুলিন পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রতিবাসী বলিয়া দামিনী তাহাকে রমেশ দাদা বলিয়া ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়াল-টিকে দামিনী বড় ভয় করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানের সময় রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত। পরা হইলে মাথা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিত "রমেশ দাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পড়াইয়া দিত। রমেশ জানিত যে গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশ দাদা তাহার "আপনার জন।" আর কেহত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশ দাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িয়া নিকটে যাইয়া দাঁড়াইত। হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিয়া আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশবে গম্ভীর হইয়াছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী, সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতরা! দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ার সকল ছেলে, মার কোলে শোয়, মার হাতে খায়, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায়, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভালবাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিনবৎসর বয়সে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত। —একটু একটু—কেবল ছায়াটি—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায় সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি

মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে, প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া সাজাইত—সাজাইয়া মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত।

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরিত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশ বৎসর পরে আর এক দিবস অপরাহ্নে একটি ক্ষুদ্র শয়নগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া সূর্য্য কিরণ শয্যায় পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইয়া গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই; এক্ষণে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনার গাম্ভীর্য জন্মিয়াছে। দামিনী স্বভাবতঃই গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে।

গাত্রমার্জ্জনা সমাধা করিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটি স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দামিনী অমনি অঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকাবয়সে যাঁহাকে দামিনী রমেশ দাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহ-লোচনে দামিনী চাহিয়া রহিল।

রমেশ দামিনীর স্বামী; দামিনীর সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় দুই একটি পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া দামিনীকে বলিলেন "কোন্ চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুরি করেছে রে?"

দামিনী বলিল "খুব করেছে। উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন, আর লোকে চুরি কর্‌তে পারে না? খুব করেছে চুরি করেছে।"

রমেশ বলিলেন, "খুব করেছে বই কি? চোরকে একবার ধরিতে পারিলে বুঝিতে পারি।"

চোর আসিয়া ধরা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধরিলেন; দুই করে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী রমেশের দুই বাহু ধরিয়া উর্দ্ধ মুখে

রমেশকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পুরিয়া আসিল; দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদর কর কেন?"

এই সময় দ্বারের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ উঠিল। যেন আর এক জন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপরিচিতা অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া দামিনীর যেন কি মনে পড়িল—কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ গলা ধরিয়া, তাহার বক্ষে মাথা দিয়া "মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ করিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন—কান্না দেখিলে কান্না পায় বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

হাঁগা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী, কিছু বলিল না, "মা মা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, দামিনী বলিলেন,

"কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমার মা আছে?"

দামিনী কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিলেন, "বিধাতা জানেন," বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

পাগলী বলিল,

"দেখ তোমার মার নামেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজি আমার মা পাইয়াছি—আমি কাঁদিব না?"

একটি কথা সহসা বিদ্যুতের মত দামিনীর মনের ভিতর চমকিল—"এই আমার মা নয় ত?"

হাঁ সেই ত মা। দামিনীর মা স্বামীর শোকে পাগল হইয়া পলাইয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কোথায় ছিল, তাহা কে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধরিয়া বেড়াইয়াছিল। আবার বহুকাল পরে, সংসার মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীর মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমার মা নয় ত?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রমেশের বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিয়া ফিরিলেন। যেখানে পাগলী দাঁড়াইয়াছিল সে দিকে আবার দেখিলেন; পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন তাঁহার অনুসরণ করি; দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকটি কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন "পাগল।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন। দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইয়াছেন, সেই অবধি মা বলিয়া ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলীর কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে গ্রামে রমেশ বাস করিতেন, তাহার দক্ষিণ প্রান্তে ভাগীরথীতীরে একটি ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে এক রাজা আপন মাতার গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায় ঐ অট্টালিকায় একটি স্ত্রীহত্যা হওয়ায় রাজার মাতা উহা পরিত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করেন নাই। অট্টালিকার ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগে কেহ এ অট্টালিকার নিকট দিয়া গতি বিধি করিতে সাহস করিত না।

পাগলী দেখিল যে এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহার বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাগলের অনেক মতিস্থির হইয়াছিল; তথাপি মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুরি করিয়া এই গোপনীয় স্থানে আনিয়া একা দেখিবে এই মনে মনে স্থির করিত। আবার পরক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিত। পাছে চাঞ্চল্য প্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক রটায়, এই ভয়ে আর দামিনীর বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালিকায় বসিয়া আপনাপনি উদ্দেশ্যে দামিনীকে আদর করিত, দামিনীকে কিরূপে রমেশ আদর করিতেছিল আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস রাত্র দুই প্রহরের সময় পাগল স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া ভগ্ন অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া অন্ধকারে কেশ শুকাইতেছিল। কেশরাশি নানাদিকে নানাভঙ্গিতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমত সময়ে পূর্ব্বদিকের অশ্বথ বৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বের চীৎকার শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল ক্রমে দুই একটি মসাল জ্বালিত হইল। এবং তদালোকে অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বারোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল ইহারা ডাকাইত; পাছে ইহারা আমার দামিনীর ঘরে ডাকাতি করে এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদের

উপর হইতে অবতরণ করিয়া ডাকাতদিগের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। ফিরিয়া ঝটিতি গৃহে আসিয়া সহসা ভৈরবীবেশ ধারণ করিয়া, করাল ত্রিশূল হস্তে লইয়া সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি পাল্কি দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে ডাকাতের সঙ্গে পাল্কি থাকে না। ইহারা বরযাত্রী হইবে। পাগল তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীর বিবাহ সে দেখিতে পায় নাই, অতএব বিবাহ দেখিবে মনে করিয়া পরম আহ্লাদপূর্ব্বক পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকারে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতকদুর গেলে একজন শিবিকাবাহক তাহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেরে তুই এমত সময় আমাদের সঙ্গে যাইতেছিস ?" পাগলী উত্তর করিল "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে বাদ্যকর নাই কেন ?"

বাহক উত্তর করিল এবড় ভয়ানক বিবাহ, এবিবাহে বাদ্য থাকে না। পাগলী একথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল "কাহার বাড়ীর বর, কাহার বাড়ীর কনে ?" বাহক বলিল "হিন্দুর কনে মুসলমানের বর।" পাগলী উত্তর করিল "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে স্ত্রীলোকটি পাগল অতএব তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে লাগিল। "কে বর ?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইল। উন্মাদিনী দেখিল অসম্ভব নহে, বয়স অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পরিচয় দিতে বাহকের প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল কিন্তু সে নিষেধ তাহার পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতেছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে করিয়াছিল যে সে ভার নামাইবে কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় তাহার আশা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, তুমি স্ত্রীলোক আমাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে অতএব তুমি পলাও। পাগলী বলিল, শুভ বিবাহকর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন ? বাহক উত্তর করিল এব্যাপার বিবাহের নহে; যিনি তাজ পরিয়া তরবারি লইয়া ঘোড়ার উপরে যাইতেছেন উনি আমাদের ফৌজদারের পুত্র। এই গ্রামে একটি অদ্ভুত সুন্দরী আছে শুনিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছেন; তাই বলিতেছিলাম কাটাকাটি হইবে।

পাগলী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল কাহার কন্যা লইয়া যাইবে ? বাহক বলিল আমি সবিশেষ জানি না, শুনিয়াছি কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূ; যুবতীর স্বামী নাকি অদ্য কয়েক দিন হইল শিষ্যালয়ে গিয়াছে। সুন্দরীর নাম বুঝি দামিনী।

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীর ন্যায় বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিল; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাহক ভয়ে বলিল, আমি দরিদ্র বাহক পেটের জ্বালায় সকল করি, আমাকে মারিলে কি হইবে; আমি হিন্দু অতএব হিন্দুর অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয়। এক্ষণে গোলযোগ করিলে এই যবনেরা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

ফেলিবে অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিয়া দ্রুত যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত কর; সকলে একত্রে প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পারিবে নতুবা আর উপায় নাই।

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল; গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, হিন্দুর হিন্দুত্ব যায় সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বনাশ হয় একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে একবার সকলে উঠ।

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল "যাউক শত্রু পরে পরে।" কেহ বলিল "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে? "কেহ বলিল "অদিতির সর্ব্বনাশ হয় যদি তাহাতে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপর দেশীয় পাইলে সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমার কল্য তোমার; অত্যাচার একঘরে প্রবেশ করিতে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি একঘরে লাগিলে সকল ঘরে আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায় কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এবোধ বাঙ্গালা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে অতএব পাগলীর চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্বৃত্ত যবনের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিল না ; রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ; দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইয়া গেল।

পাগলী দেখিল কেহই উঠিল না, কেহই সহায়তা করিল না। রমেশের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, সকল ফুরাইয়াছে; দামিনীকে লইয়া গিয়াছে। তখন পাগলীর কপোলমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলী পূর্ব্বমত উন্মত্তা হইয়া সিংহীর ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইল। শেষে ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিল।

যবনেরা একপ্রান্তরের মধ্য দিয়া দামিনীকে লইয়া যাইতেছিল। পাল্‌কির চারিদিকে অস্ত্রধারী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদারপুত্র অশ্বারোহণে যাইতেছিল। পাগলী বায়ুবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদার-পুত্রের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদার পুত্রের শরীর প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল; পদাতিকেরা ফিরিয়া দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আর তাহার স্মরণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না।

পদাতিকেরা দেখিল যে ফৌজদারপুত্র সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কিতে তুলিল। পাল্কি হইতে দামিনীকে ফেলিয়া দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তরে পড়িয়া রহিলেন। নবপল্লবিত লতা বৃক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া পথে

ফেলিয়া গেলে বাতাসে তাহা উলটি পালটি করিতে থাকে, প্রান্তরে পড়িয়া দামিনীর সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহার অঞ্চল উলটি পালটি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই; দামিনী নাই, সন্ধ্যার আয়োজন আর কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিয়া রহিলেন; ক্রমে প্রতিবাসিগণ, গ্রামবাসিগণ, আত্মীয় কুটুম্বগণ আত্মীয়তা করিতে আসিলেন। কেহ বলিলেন "কি বিপদ, কি বিপদ, কেহ বলিলেন "কখন কাহার কি ঘটে কে বলিতে পারে?" কেহ বলিলেন অদৃষ্টই মূল। অদিতি বিশারদ ইহার কোন কথাতেই উত্তর করিলেন না দেখিয়া গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশরীর প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার পূর্ব্বে কি কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে মহাশয় কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি বিশারদ ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিব তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই রাত্রে রমেশ থাকিলে শৃগালের সাধ্য কি সিংহের গৃহে প্রবেশ করে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন "রমেশের প্রয়োজন কি? আমারাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন সকল সময় সাহস হয় না; যবনেরা প্রায় বিশজন আমরা একা; বিশেষতঃ তখন যদি সদর বাড়ীতে থাকিতাম তবে যা হয় একখানা করিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা রমেশের দুরদৃষ্টবশতঃ আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে ওঠা যায় না; তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, ভালকরে কাপড় পরিলাম। সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্য শম্বুক বাহির করিলাম, একটিপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলাম; এসকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এসকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নয়, কি জানি পাছে যবনেরা পিছলে পালায় এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না গাত্রমার্জ্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম পুতির তক্তা আন। ব্রাহ্মণী বলিলেন তাহার কর্ম্ম নহে। শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটি ইট আনিয়া দিল, আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে; আমি অমনি সেই ইট ছুড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন এমত সময় একজন কৃষী আসিয়া বলিল যে ফৌজদারের পুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে তাহার স্থির নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে; নিশ্চয় বলিতেছি আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।

আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিয়াছেন তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত স্বরে বলিতে লাগিলেন আমি উপহাস করিতেছিলাম; আমি তা বলি নাই; আমি কি বলেছি, কিছুই নহে। আমার দ্বারা হাকিমের অনিষ্ট হইবে, কখন সম্ভব নহে। আমি বরং বলেছি যে এত ডাকাডাকি করেছে তথাপি কথা কই নাই। রমেশ বড় না হাকিম বড়। এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদারপুত্রের মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল সে অদিতি বিশারদকে বলিল যে মহাশয়ের পুত্রবধূ বাড়ী ফিরে আসিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশারদ সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশারদ আপনই সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা? সকলে উত্তর করিল যে মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতি বিশারদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দরে যাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "সেই বউকে আবার ঘরে? তোমার ইচ্ছা হয় তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া সংসার কর।"

কর্ত্তা বলিলেন "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। দোষ তবে সকল আমার।

ক। না, তোমার দোষ দিই নাই আমি জিজ্ঞাসা করি পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে।

গৃ। দোষ অনেক। প্রথমে লোকে গালে কালি চূণ দিবে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যেরা ত্যাগ করিবে, তখন আমার এই শিশু সন্তানের কি উপায় হইবে?

ক। কেন লোকেরা দোষ দিবে? আমাদের পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছা পূর্ব্বক যায় নাই। যবনগৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃ। কুলত্যাগী নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় নাই, একথা তোমায় কে বলিল? তুমি সকল সম্বাদই প্রায় জান। কয় দিবস পর্য্যন্ত এক মাগি পাগলের বেশ ধরিয়া যাতায়াত করিতেছিল; সে দিবস সন্ধ্যার সময় বধূকে লইয়া পলাইতেছিল, আমি যাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। ফিরে এসে বালিশ মুখে দিয়া যে আবার মেয়ের কান্না! আমি কি সকল কথা তোমায় বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে আমি থাকিতে আর পালাতে পারিবে না, তখন এই পরামর্শ করিয়া লোক জন আনাইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন "তুমি যাহা বলিলে তাহা আমার বিশ্বাস হইল। কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন "আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী। এক্ষণে জানিলাম তাহা নহে; তোমরা আমার আত্মীয় তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেকদিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর দ্বারভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাঁহারে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি। শাস্ত্রে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটি বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরাই তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধূকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি? যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম; শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এই পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই। বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।"

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন আপন গৃহ সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা দেশ উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন এখন কি বলিতে হয় যাইয়া বল।" ইহা শুনিয়া অদিতি বিশারদ খিড়কি দ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না কাঁদিয়া উঠিলেন বড়, যন্ত্রণা পাইয়াছেন! অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন কিন্তু এসময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সম্বরণ করিলেন। পরে নস্য শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সকল দিগ্ ভাবিয়া দেখিলাম তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ; ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না; অতএব স্থানান্তরে যাও।" এই বলিয়া অদিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। দামিনী প্রথমে বুঝিতে

পারিলেন না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিগ্ চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটি চিল বসিয়া আছে; খিড়কি পুষ্করিণীর কাল জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে, ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে রাখিয়া গিয়াছে তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এখনও তাহা রুদ্ধ রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাত দিয়া দেখিলেন পরে আপনার গাত্রে চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন স্বপ্ন নহে—সকলই সত্য! গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিয়া গেল, সকলই অন্ধকার হইল, দামিনী পড়িয়া গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেকগুলিন বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা, যুবতী, বালিকা সকলে আসিয়া দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। যেখানে পড়িয়া গিয়াছিলেন সেই খানে নতমুখে বসিয়া একটি দূর্ব্বাদল, নখদ্বারা ছিঁড়িতে ছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল করে ভারতে এসেছিলে! আহা কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য!" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপ্রতি ব্যথিত হরিণীর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন "এমুখপ্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না। ধর্ম্ম বড় হল না, জাত বড় হল। আরে পোড়া বিধাতা! কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না! এই বয়সে এই কষ্ট! আহা! মরি মরি! মেয়েত নয়, যেন স্বর্ণলতা!"

আর একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা! দামিনী আমাদের চিরদুঃখিনী; বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিল যে 'এতদিনে আমার দামিনীর উপায় হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।" আহা! যদি বুড়ি বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁড়াইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল; শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায় কার কাছে ফেলে আপনি চলে গেলে!" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার শ্বাশুড়ি রাগভরে সশব্দে খিড়কি দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "বলি বউ! তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এই দুই প্রহর বেলা গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া মরা কান্না আরম্ভ করিলে? জাননা কি যে এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার আপনার ঝি বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময় পাইয়াছ, ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না, সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদের মধ্যে একজন সমবয়স্কা একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বার রুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন "একবার উঠত।" দামিনী বলিলেন, আমি আর কোথাও যাব না; কোথাও যাইবার আর আমার স্থান নাই; কেহ আর আমায় স্থান দিবে না। সমবয়স্কা বলিল তবে কি এই খানে মরিবি? দামিনী উত্তর করিলেন এইখানেই মরিব আমার স্থান কোথা? তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গেছেন আমি এইখানেই থাকিব। যতদিন না তিনি আসেন ততদিন যেমন করে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।

এই বলিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন অন্যত্র না যাও এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস; রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে আমরা আর দাঁড়াতে পারি না। দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায় না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড়মানুষ এই রৌদ্রে তোমায় খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তরক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ না হইতে হইতেই অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে বসিয়া অন্যমনস্কে একটি পক্ষী দেখিতেছেন। আর চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিয়া দামিনীর নিকটে বসিলেন। পরস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয়। যাহা হউক ভালমন্দ একটা স্থির হইয়া যায়।

দা। তিনি যদি আসিয়া পথ হইতে ফিরে যান?

প্র। সেকি! তাকি হইতে পারে?

দা। পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায়। তিনিও কি আমায় ত্যাগ করিবেন?—

প্র। কি জানি ভাই! পুরুষের মন কখন কেমন থাকে তা কে বলিতে পারে?

দা। তিনি আমায় কত ভালবাসেন। আমায় দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায় দেখিবার তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে কামার কাছে আসিয়া বসেন। কতবার কতদিকে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন; দাড়িতে হাত দিয়া দেখেন; ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন; দেখিয়া আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হল না।

রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকি।

এই বলিতে বলিতে দামিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, রাত্রিযাপন কিরূপে হইবে? কোথায় থাকিবে?" দামিনী প্রথমে বলিলেন "কি জানি, পরক্ষণেই বলিলেন এইখানেই থাকিব। কে আমায় স্থান দিবে?"

প্রতিবাসিনী শিহরিয়া বলিলেন "তাকি স্ত্রীলোকের সাধ্য! এই অন্ধকার বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পারে না, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে। রাত্রের নিমিত্ত ঘরে না হউক বাটীর অন্য কোন চালায় শ্বশুর শ্বাশুড়ী কি স্থান দিবেন না! অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলেন যে রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু রাত্রি হইল প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহার তত্ত্ব করিল না। খিড়কি দ্বার এতক্ষণ মুক্ত ছিল শেষে তাহাও রুদ্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। দূরে যে দুই একটি দীপালোক দেখা যাইতেছিল তাহা একে একে নিবিয়া গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীর ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনার ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবার ভয় পাইতে লাগিল অন্ধকারে নানা দিকে নানা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবার সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দামিনী ধূলায় শয়ন করিলেন। শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন কে ডাকিল "মা!" স্বপ্নে যেন উত্তর দিলেন, "মা!" স্বপ্নে যেন বোধ হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা!—এ ঘরে আর কাজ কি?"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া কেহ আর দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দশ বারো দিবস পরে রমেশ বাটী আসিয়া সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতা প্রতি দোষারোপ করিলেন না, কাহারেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ করিলেন কোথাও দামিনীর সম্বাদ পাইলেন না। শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষন্নভাবে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ, আপন আপন মূল বিদ্ধ করিয়া সাহঙ্কারে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতেছে।

রমেশ অগ্রসর হইলেন, দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকালপরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের শব্দ থামিল। ঘর ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই কক্ষান্তরে মনুষ্য-কণ্ঠ নিঃসৃত একটি মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশের শরীর কণ্টকিত হইল। রমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেইদিকে গেলেন। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন মৃত্যুশয্যায় একটি রুগ্ন মনুষ্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরদেহ একেবারে সংজ্ঞাহীন হয় নাই, তাহার কণ্ঠস্বর আবার অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে লাগিল। "আমি! একে? বলো, আর বিলম্ব করিব না কেবল একবার রমেশকে দেখে আসি।"

রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "দামিনি, দামিনি! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।

দামিনী কোন উত্তর দিল না। রমেশ আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "আবার কথা কও, অনেক দিন কথা শুনি নাই; আবার কথা কও।" আর কোন উত্তর নাই সকল নিঃশব্দ। রমেশ কতক বুঝিলেন; রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন সেখানে আর একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দামিনী এজন্মের মত চক্ষু মুদিয়াছেন।

রমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিয়া রমেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন যে এই পূর্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে; ঘুমাইতেছে;" পরক্ষণেই আবার বিকট হাসি হাসিয়া রমেশের উপর পড়িয়া রমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিয়া বলিল, আমি চিনিয়াছি তুই রমেশ; তোর জন্যই আমার দামিনী মরিয়াছে।"

রমেশের শ্বাস রুদ্ধ হইল; চক্ষুর শিরা সকল উঠিল। রমেশ বাক্যরহিত শক্তিরহিত, শেষে দামিনীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার রমেশের গলদেশ পূর্ব্ববত ধরিল। এবার সকল ফুরাইল।

সুবর্ণ-গোলক

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কৈলাস-শিখরে নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছেন। বাজি একটি স্বর্ণ-গোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময় বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নায়ে অদ্বিতীয়া, কেন না, তিনি আদ্যাশক্তি! মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিনি চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বকৃত কাঞ্চন-গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া পঞ্চানন ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?

উমা কহিলেন, "প্রভো, আপনার গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু এবং আমি এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয়না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলীর বলেই ঘটিবে। কাঞ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গদোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।"

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ। কয় বৎসর হইল, পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁর স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্ত বাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী যাইতে-ছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া

যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্ত বাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন; দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন। বলিলেন, "এটা সোনার দেখিতেছি, কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্ত বাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্ত বাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা!"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা!" রামা বলিল, "তুই বড় বে-আদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বে-আদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বে-আদবি করিতে পারি?"

* * * *

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালী-কান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর; কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খান্সামা, রামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্ত বাবু!"

কালীকান্ত বাবু যখন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খান্-সামাজি, তোম হুঁয়া মাৎ বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে—"যা বেটা মেড়ুয়াবাসী যা—তোর আপনার কাজ কর্ গে।"

দ্বারবান্ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া দিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ান্জি, বাবুকে অপমান করিও না, রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাই বাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে উনি

কোন ছদ্মবেশী বড়লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গোলাম কি কসুর মাপ কিজিয়ে?" রামা কহিল, "আচ্ছা, তামাকু ভেজ দেও।"

শ্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, "দাদ ঠাকুর, এ কি?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব অন্তঃপুরে গিয়া সংবাদ দিল, জামাইবাবু আসিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে এক জন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাই বাবু তাঁহাকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্ত্তা নীলরতন বাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধুলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে, —জামাই বাবাজীকে কেমন দেখিতেছি।

নীলরতন বাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে অন্তঃপুরে হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি? আগে বাবুকে জল খাওয়াও, তার পর আমার হবে এখন। আমি, মা ঠাকরুণ, আপনাদের খাচ্চিই ত।"

"মা ঠাকরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাই বাবু আমাকে এক জন শাশুড়ী-টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না কর্‌বেন কেন, আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিন্‌তে পারেন —কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাই বাবুর উপর বড় খুসী হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাই বাবুর বিবেচনা ভাল, সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, "সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা তার জায়গা হউক বাহিরে, আর জামায়ের জায়গা হউক ভিতরে।" গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, "এ কি অলৌকিকতা?" এ দিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল; ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর

কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা-গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শালীরা বলিল, "বোনজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।" কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" এক জন প্রাচীনা ঠাকুরাণী-দিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।" এই বলিয়া কালী-কান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়াছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ও কি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট শিখিয়া আসিয়াছ?" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি আমার মুনিব।"

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্ক থাকিবে, এখন জল খাও।"

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা,—এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সরাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল; বলিল, "ওরে আমার সোনার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণি! আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরু-জন, আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল যে, এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণমাত্র কালীকান্ত সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া, "বাবা রে, গেলাম রে, আমায় মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর বস্ত্র ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস্?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন? আমি মারিব কেন? আমার যেমন পোড়া কপাল!" ক্রমে ক্রমে স্বর কাঁদুনিতে চড়িতে লাগিল—"আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে," বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ, তুই মেরেছিস্, নহিলে অমন ক'রে কাতরাবে কেন!" এই বলিয়া সকলে কামীকে "পাপিষ্ঠা" "ডাকিনী" ইত্যাদি কথায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এ দিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতন বাবু স্বয়ং, দ্বারবান্ ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাথি, চড়-চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, "ছেড়ে দে রে, বাবা রে, জামাই মারে, এমন কখন শুনি নাই। আমার কি, তোদেরই মেয়েকে একাদশী করিতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্ব্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্ত বাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরতন বাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্, মার বেটাকে জুতো।"

এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণমাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দ্দোষী রামার উপর প্রহার-বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণগোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতন বাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ও মিন্সে চোর! দেখুন, ও একটা সোনার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরতন বাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন। তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগী আবার এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগী বলিতেছিস্?" উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকা দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল, উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া নীলরতন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্ত্তা মহাশয়, মাগীর কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্ত্তা

তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব মারিতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ও-ও চাকর, আমিও চাকর, আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরী করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ? আমার চাকর—আবার তুমি কিসে হ'তে গেলে?"

উদ্ধব অবাক্ হইল; মনে করিল, "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এ দিকে কর্ত্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কানে গেল না, সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগী, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া, গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, "গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস্ না কি? যা, গোরুর জাব দি গে যা।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম-মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, "যা! পোড়া কপালে মিন্সে কর্ত্তাকে ঠেঙ্গাইয়া খুন কর্‌লে।" এ দিকে তরঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত তুলিস?" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা স্বর্ণ গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?"

কৈলাসে পার্ব্বতী বলিলেন, "প্রভো, আপনার গোলক সংবরণ করুন—ঐ দেখুন। গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী-সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে। এ দিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায় আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সংবরণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি

আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে? কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সংবরণ করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।"

নাক্ কাটা বঙ্ক

—কালীপ্রসন্ন সিংহ

হরিভদ্দর খুড়োর কথা মত—আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ির হেড্ ক্যারাণী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশল বলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘায়ে খোয়ে ফেরেন—যে রকমে হোক্ কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য।

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলে ব্যালায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। এক দিন মামার বাড়ি খ্যালা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান—তাতে নাক্‌টি কেটে যায় সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাক্ কাটা বঙ্কবেহারি" বলেই তাঁরে ডাক্‌তো, শেষে উকীলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারি বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম ; তাঁর দাদা, সেলরদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিনি ভাইয়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারী বটে, সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাক্‌বে বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্ক-বেহারি বাবুরা সিম্‌লের এক জন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠ্‌ছিলেন, হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে লোকের মেজাজ যে রূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝ্‌তেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই এক জন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়্‌লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্য্যন্ত আইনবাজ হয়ে থাকে, সুতরাং বঙ্কবেহারি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিলো—আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিম, ইকুটির খোঁচ ও কমন্‌লার প্যাঁচে—বঙ্কবেহারি বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন। ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে ফাঁদ প্যোতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক চাচাও তাঁর কাচে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যার পরে বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে পোঁছিলাম আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেতে পারি নাই ; রাস্তা হতে একজন ঝাঁকা মুটে ডেকে তার ঝাঁকার বসেই যাই ; তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব

হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে—দুঃখের বিষয় এই যে, সেটী সব্ সময় ঘটে না। পাঠকরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন্, তা হলে জন্মে আর গাড়ি পাল্‌কী চড়্‌তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন ইস্প্রীংওয়ালা কৌচ্!

আমরা বঙ্কবেহারী বাবুর বাড়িতে আরও অনেকগুলি ভদ্র লোককে দেখ্‌তে পেলেম, তাঁরাও "সোণাকরার" বুজরুকী দেখতে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথা বার্ত্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সে ঘরটী বঙ্ক বাবুর বৈটকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা শুদ্ধু পায়েই ঢুক্‌লেম্; ঘরটি চার কোণা সমান, মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্‌ছাল বিছিয়ে বসেচেন, সামনে একটা ত্রিশূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সাম্‌নে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলী ও আগুনের মাল্‌সা—সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চ্যালা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডার সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন-শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বসতে বল্লেন।

যে মহাপুরুষের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য! এই কন্ধকাটা! এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী–এই শেতলা! ছেলেদের কথা দূরে থাকুক বুড়ো মিন্‌সেদেরও ভয় পাইয়ে দ্যায়! সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জাগজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দু-সন্তান মাত্রকেই সেওরাতে হয়ে ছিলো! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাতরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তর সেই পাতরের ওপোর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না; রে বিশ্বাস? তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে এক জনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে; আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টা ক্যাণেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নোড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজ কাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানেসেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে

প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্মসমাজ, রীতি, ও নিয়মও অ্যাড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তাঁরসুত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছর হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটি অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্র লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছু মাত্র বিষয় জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে "ঘোড়ার ডিম" ও "আকাশকুসুমের" দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং এক দিন আমরা তাঁরে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাক্‌লেও ডাক্‌তে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বস্‌তে বলে অন্য কথা তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বঙ্ক-বেহারীবাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারীবাবু মাতায় একটি জরীর কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" প্যেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনী মাত্র ব্যবহার করে ছিলেন, আর হাতে একটি লাল রঙ্গের রুমাল ছিল তাতে রিং সমেত গুটীকত চাবী ঝুলচে।

বঙ্কবেহারী বাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও স্যেকহ্যাণ্ড চুকলে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বল্লেন যে এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজরুকী ও ক্যারামত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশ মত দুই একটা জাহির করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্ক-বেহারীবাবু প্রোগ্রাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমে ঘটের উপর হতে একটি জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কটো ব্যাংঙের মত থপাস করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, সন্ন্যাসী তার দুহাত তফাৎ বসে রয়েচেন—এ দেখলে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়, সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক ক্ষণিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা বুক্‌খানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! এমন সময় এক জন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুদ হয়ে যাবে; পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকদের সন্দেহ হয় তার জন্য সন্ন্যাসী একটি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদ টুকু ঢ্যেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে ভর হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে!

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুহুঙ্কার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁত্‌কে উঠ্‌লো, বুড়োদের বুক গুর্ গুর্ কত্তে লাগ্‌লো; ক্রমে এক জন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে "গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুদ হো বেটা!" বলে তাতে এক কুশী জল ফ্যালবামাত্র সরার মদ দুদের মত সাদা হয়ে গ্যাল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এই রকম নানা প্রকার বুজরুকী ও কার্দ্দানীর প্রকাশ হতে হতে রাত্তির এগারোটা বেজে গ্যাল সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্কবাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো; আমরা রাম রকমের একটি প্রণাম দিয়ে একটি উল্লুক হয়ে বাড়ীতে এলেম—একে ক্ষুধাও

বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকা-মুটেটি যে রাৎকানা তা পূর্ব্বে বলে নাই সুতরাং তার হাত দুটি ধরে গুটি গুটি করে উজোন আদ ক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পৌচে রেখে তবে বাড়ী যাই, দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিলো, দোকান গুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভোম্বা হয়ে সে রাত্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্ব্বে বলে এসেচি "দশ দিন চোরের এক দিন স্যোদের" ক্রমে অনেকেই বঙ্কবাবুর বাড়ীর সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরী ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম; পূর্ব্ব দিনের মত জবা ফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, এমন সময় একজন মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাশের বাঙ্গালা ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন, শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল!

সংসারের গতিই এই, একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বালুঞ্চী বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তুবড়া তুবড়ির খানা-তল্লাসী কত্তে লাগলেন; একজন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোন থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দ্যান; সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না প্যোরে ঘরের কোণেই (ফোরওয়ালা মেজে নয়) পুতে রেখে ছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটা সিং বেরিয়ে ছিলো—সুতরাং একজনের পায়ে ঠ্যাকাতেই সুসন্ধানে বেরুলো। সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুদ্ করেছিলেন, সে দিন তারও জাক্ ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিসের একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বল্লেন যে আমেরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়। এই রকম ধরপাকড়ের পর বঙ্কবেহারী বাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে; আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ফিরে গেলেম; হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কোড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজ্‌রুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

হাবা

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভিজিতে ভিজিতে বিশ্বনাথ গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,–"না ভিজ্‌লে নয়?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,–"স্ত্রীলোকটী মারা যায়।"

গৃহিণী। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্য্যোগেও বাহির হইয়াছ।

বিশ্বনাথ। কি জান, পরোপকার পরমধর্ম্ম। শিশু সন্তানটী জিজ্ঞাসা করিল,–"বাবা, তুমি যে বাইরে গেলে, আমার পুজার জুতা আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমাকে দাও।" কুক্ষণে বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল, "আমি অভাগা, পরোপকারক! আমার উপকারক কৈ?"

বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বহির্ব্বাটীতে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,–"কে গা?" আগন্তুক উত্তর করিল, "হরমণির পরমকাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন, "যাও যাচ্চি," কিন্তু গেলেন না। পূজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটিকে জুতা দিতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে বলবান্ হইতে লাগিল। অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্য সকলই ব্যয় হইয়াছে, আজ সেই ক্ষোভ হইল। তেমন বয়স নাই যে পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাহা আয় আছে সংসার নির্ব্বাহ হয়-মোটা ভাত মোটা কাপড়; তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্ব্বাটীতে আবার ডাক হইল,– "বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে আছেন?" বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,–"কি, সংবাদ?" আগন্তকের নাম কেনারাম। উত্তর করিলেন,— "মহাশয়ের কৃপায় যে চাকরীটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশজনের কথায় রায় বাহাদুর আমায় চোর ঠাওরাইয়াছেন। বিশ্বনাথ উত্তর করিল,–"আমি কি করিব?"

কেনারাম। দুই এক কথা আমার হইয়া বলিয়া দিবেন।

বিশ্বনাথ। আমার লাভ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। "লাভ" এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্ব্বে কখন

শুনেন নাই; সুতরাং, উত্তর করিলেন,–"আজ্ঞে ?" বিশ্বনাথ বলিলেন,–"আজ্ঞে রাখ। লাভ এ কথার অর্থ বুঝ না ?" কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন,–"তাই ত তাই ত।" কেনারামের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না। যাহার জুতার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন, "পল্লীতে এমন কে আছে যে, আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই ? কেহ লাটসাহেবের দেওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাহারও একমাত্র সন্তান আমার যত্নেই বাঁচিয়াছে, কাহারও আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্য দশা কে দেখে ?" পরোপকার যে সুদে খাটাইবার জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না। বলিয়াছি, বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না, ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নানাবিধ উপায় অবধারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় পরপীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন হয় না, এই কথাই সাব্যস্ত হইল। "পরপীড়ন করিব ? ক্ষতি কি ?" একবার একটু ক্ষতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না। সাব্যস্ত হইল পরপীড়ন করিব। বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না।

দোর খুলিয়া দেখিলেন, ঘনঘটাবৃত রজনী টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক এক বার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবেন না। এরূপ যাওয়া বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়াছেন কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর চরমকাল উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন। দেবেন্দ্রবাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশু সন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেন্দ্রবাবুর রুগ্ন শয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেন্দ্রবাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না, সেই প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত। কোঁচা বা অঞ্চল বার বার চক্ষে উঠিতেছে। কিন্তু একটি রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছে না। সৌদামিনীকে পূর্ণযৌবনা বলিলেও বলা যায়, অল্প বয়সে দুটি সুসন্তান হইয়াছে। সৌদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার কহিয়াছেন যে, একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেন্দ্র একবার ইঙ্গিত করে—"জল চাই, বা বাতাস চাই"—কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে ? পতিপরায়ণা সৌদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই।

এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা কহিলেন, পুনর্ব্বার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,–"মা আহার হইয়াছে ?" এ কথায় সৌদামিনীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না। বিশ্বনাথ কথার প্রতীক্ষা করিলেন না, বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে, সৌদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ এইরূপ বিশ্বনাথের

কার্য্য। বিশ্বনাথ খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন; যেন সেই অবস্থায় চিরদিন আনিতেন। কার্য্য সমান হইল, কিন্তু সে ভাব নাই, সৌদামিনীকে বলিলেন,–"আমি শিয়রে বসিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার কর।" ক্ষুধার অনুরোধ যত হ'ক বা না হ'ক বিশ্বনাথের কথার অনুরোধে সৌদামিনী উঠিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিয়রে বসিলেন, সকলকে বলিলেন–"ডাক্তারবাবু আমায় বলিয়াছেন, এত লোকসমাগম ভাল নয়।" সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রের কর্ণে বলিতে লাগিলেন "দেবেন্দ্রবাবু, দুটি ছোট ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।" দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন– "বিশ্বনাথ বাবু, আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সৌদামিনী বলে, আমি বাঁচিব?" বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন,–"আমি তা বলিতেছি না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,–"বুঝিলাম, কিন্তু সৌদামিনী যেন এ কথা না শুনে।"

বিশ্বনাথ বলিলেন,–"শুনা আবশ্যক। কারণ তিনি ব্যতীত অছি হইবার জন্য কাহাকেও দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন,–"কেন মহাশয়, আপনি হউন না?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,–"আমার ইচ্ছা বটে কিন্তু ভয় পাই, পাঁচ জনে কি বলিবে।"

দেবেন্দ্র। পাঁচজনে যাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে। সৌদামিনী ছেলেমানুষ, আমার সন্তানগুলির আর উপায় দেখি না!

বিশ্বনাথ। ভাল, ঝঞ্ঝাট বাড়িবে, কি করিব? আমি স্বীকৃত।

দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইল। সৌদামিনী তিন দিবস কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটি একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুধ দিয়াছে, তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি কেন ভরসা করিল, সৌদামিনীকে 'মা' বলিয়া ডাকিল। সৌদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন,–"আমার নীরদ কোথা?" নীরদের মার কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল। কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুম্বন করিলেন মাত্র। দাস দাসীর অভাব নাই তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,–"মা গো, গৃহিণী পীড়িত, হরিমণকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার নিকট শুনিলাম, তুমি তিন দিন আহার কর নাই। শোক কর, শোকেরই কারণ বটে, কিন্তু এক একবার ছেলেগুলিকে না দেখিলে ত নয়? মা, চিনির পানা আনিয়াছি, একটু মুখে দাও!"

সৌদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন,–"উঠ, স্নান কর। রাধামণি দুটি প্রসাদ আনিয়াছে, তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

সৌদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে, নীরদের মুখ দেখিয়াছে, "কাঁদিব" ভাবিল, "কিন্তু মরিব না।" উঠিল, রাধামণির প্রসাদও স্পর্শ করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন,–"মা, তোমার স্বামী আমার প্রতি একটি গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি কখন বিষয়ী নহি, এ বিষয়-কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব, এই ভাবিতেছি। যদি কেহ এমন থাকে, আমি দেখিব শুনিব, সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুইবার আসিতে হইল। কর্ম্মোপলক্ষে আসিতে যাইতে হইবে, আমি তাই ভাবিতেছি।"

সৌদামিনী উত্তর করিলেন,–"বাবা, তুমি না আসিলে কে ছেলে দুটিকে দেখ্‌বে, আর আমার ত কেহ নাই যে দেখে?"

আরও কথোপকথন হইল, সৌদামিনী ভাবিলেন, বিশ্বনাথ যথার্থই মহাত্মা।

দিন যায়, থাকে না। সৌদামিনীর মুখে সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে হাস্য দেখা দেয়, কিন্তু ঘনমালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি সহজ জ্ঞানে অনুমান করিতেন যে, তাঁহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এ বাড়ী কাল সে বাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই। বিশ্বনাথ বলেন 'আবশ্যক', সুতরাং স্বাক্ষর দেন; কিন্তু এবার যা কথা হইতেছে তাহাতে স্বাক্ষর দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। বিশ্বনাথের আর দৈন্য দশা নাই, কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্রাসে গ্রাসে গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়া যে সুখ ছিল, তাহা আর বিশ্বনাথের নাই।

'পরোপকার পরম ধর্ম্ম' এই কথাই প্রচার, তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপস্বত্ব বিশ্বনাথ ভোগ করেন।

পাঠক, সেই ছেলেটিকে মনে করুন, যার জুতার নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দ্দশা। সে নোট কাটে, সৌরভকে রাখিয়াছে, পূজাতে সৌরভের মাকে বারাণসীর সাটী দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত দেখা হয়, ইহাতে যদি সুখ থাকে—থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার পুত্রের সমবয়স্ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি। যদি কখন মাকে কাঁদিতে দেখে, ভয়ে সৌদামিনী কাঁদে না; বলে–"মা গো, হাবাকে আমি মানুষ করে তুলব, আর আমি কি মোট বইতেও পারিব না?" সেই সময় নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সমবয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ বুঝিতে পারিলাম না। যখন দেবেন্দ্রের শিয়রে সৌদামিনীকে দেখিয়াছিলাম, আমাদের পরম রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না, বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে দেবেন্দ্র পাছে ভয় পান, এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল–এখন তাহার আবশ্যক নাই। ম্লানচীর রুক্ষকেশ, চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, তথাপি রূপ যেন ধরে না! একি রূপ? একি সন্ন্যাসিনী? না, তা ত নয়; নীরদ ও হাবা দুটি ছেলে রহিয়াছে, সন্ন্যাসিনী ত নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য চাও, যদি কেহ স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ মেঘাবৃত

চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাক, যদি কেহ মেঘমলিন দিনকরের রশ্মি পদ্মের উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সৌদামিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সে রূপ দেখিয়াছিল। এখন আর শিশু-সন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সৌদামিনী সম্বন্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, কি জানি যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? "নীরদ নীরদের ন্যায় গম্ভীর, সকলই করিতে পারে। অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে করিলে সৌদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেকদিন সৌদামিনী কি বলি বলি করিয়াছে, কিন্তু বলে নাই।"

তুমি বুঝ নাই, সৌদামিনী 'বলি বলি' করিয়াছে যে, তুমি দুরাত্মা, কিন্তু বলে নাই। রুদ্ধ-শ্বাস বশতঃ যে উন্নত হৃদয় দেখিয়াছ, তাহা প্রেমে নয়; যে লজ্জা দেখিতেছ, তাহা কি বলিব? সৌদামিনী বুদ্ধিমতী, সকলই বুঝিয়াছে। তোমায় যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা করে, বলে "কেন এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর।" কিন্তু অবলা, ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীরা রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে; এমন সময় বিশ্বনাথ সৌদামিনীর বাটীতে উপস্থিত, বিশেষ কার্য্য। দাসী সৌদামিনীর শয়নগৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না; অবশ্যই বিশেষ কার্য্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছেন দেখিলেন, তাহা সৌদামিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ সৌদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন,—"আমায় দয়া কর!" সৌদামিনী কিছুই বলিলেন না, নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইল না, ঠিক বিপরীত হইল। এক সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয়, পাঠক ভাবুন। আমরা নীরদের কাছে যাই।

পরচর্চ্চা-প্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বার বার আইসে কেন। ইহা যে জিজ্ঞাস্য, তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এত রাত্রে বিশ্বনাথবাবু কেন আসিয়াছিলেন?"

সৌদামিনী। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নীরদ। মা, একি মা?

সৌদামিনী। এ কি? আর বলিব না, নীরদ, আমার বোধ হয়, যদি পুরুষের সহিত আমার না সাক্ষাৎ হইত, আমি দুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন। হাবা নিদ্রিত। সৌদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল,—"মা, তুমি ত আমায় একলা শোয়াও; আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ? আমি আর ভয় পাই না।" সৌদামিনী বলিলেন,—"হাবা ওঠ্, আমার বিপদ, স্বামী নাই, তুই সন্তান, তোরে না বলিয়া কারে বলিব?"

হাবা বোকা ছেলে, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিল। সেই শিশু-সন্তানের চাহনীতে বহু দিন পরে সৌদামিনী সুখী হইলেন।

"মা, তুমি দাদাকে বল না, দাদার গায়ে বেশী জোর, আমার গায়ে তত জোর নাই। চল মা, আমরা পালাই।" সৌদামিনীর মনের দুঃখ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশু-সন্তানকে বলিতে গিয়াছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়। কিন্তু ছেলেটি বলিল, পালাই। কেন পলাইব? হাবা বলিয়াছে পালাই, পলাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আমায় বলিল,—"মা, চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করবার দরকার নাই। আমি জানি, আর তোর কিছু বিপদ নাই, সে এক একবার আদর করিয়া চায়, আমার বোধ হয়, আমায় মর্‌তে বলে।"

হাবা,—হাবা নয়, হাবা যেন উন্মাদ!

সৌদামিনী। হাবা, ঘুমো।

হাবা। না মা, চল, আমরা দুজনে পালাই। দাদা যায় যাবে, নয় আমরা দুজনে পালাই।

পূর্ব্বদিকে স্বর্ণকান্তি মেঘ দর্শন দিল। সরোবরে নির্ম্মল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল 'মা' বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল—"মা, কৈ চল।"

সৌদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল জানি না; কিন্তু কখন কখন সেই জ্ঞান মনুষ্য হৃদয়ে উদয় হয়, কারণ খুজিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটি সত্য। সৌদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষমাত্রেই জানেন যে তিনি রমণীপ্রিয়। বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে, তিনি সৌদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। "কি এত স্পর্দ্ধা! আমাকে বিমুখ করে।" তাঁহার রোষের উদয় হইল।

অবিলম্বে সৌদামিনীর সর্ব্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল,—"এখন মা, চল।"

সৌদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, ভারি ছেলে কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল, "মা, তুই কি আমায় কোলে করিতে পার্‌বি? এখন তোকে আমি কোলে করিয়া পথে লইয়া যাব।"

সৌদামিনী। কোথায় যাবি হাবা?

হাবা। কুটীরে।

সৌদামিনী অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, হাবা বলিল,—"কেন মা, কাঁদ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল যাই।"

সেই দিন প্রাতে নীরদ বাটীতে নাই। সৌদামিনী তিন দিন অপেক্ষা করিলেন, যথাসাধ্য তত্ত্ব করিলেন, কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল,—"দাদা আমাদের সঙ্গে যাবে না।" সাতদিন কাঁদিয়া সৌদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে

বিশ্বনাথ প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার সুখ-সম্ভাবনা বলিয়াছে। সপ্তাহ পরে সৌদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন। মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল। হাবা ভয় পাইল না। পরক্ষণে মাতাল বলিল,–"তুই কে রে– কে রে?" হাবা বলিল,–"আমি দেবেন্দ্রবাবুর ছেলে।"

মাতাল। সঙ্গে মাগীটা কে রে?

হাবা। আমার মা।

শুনিবামাত্র মাতাল সৌদামিনীর পদপ্রান্তে ঢিপ্ করিয়া গড় করিল, কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ত্রুটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া হাবাকে ডাকিতে লাগিল,–"আয়, এ দিকে আয়, টেনে নিয়ে যাই চ।" হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল,–"মা চল এর সঙ্গে যাই।"

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সৌদামিনীকে মাতালের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করুন। মাতাল হইলে কি হয়? যদি তার ভাবের ত্রুটি না থাকে। আর হাবার পরামর্শে বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সম্বল, কোথায় যাইব তার স্থির নাই; ইহাতে মাতাল কি, পুরাতন গল্পের ব্যাঘ্রমা-ব্যাঘ্রমী ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন। বহির্ব্বাটী হইতে মাতাল আপনার গৃহিণীকে ডাকিল, সৌদামিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিণী বাহিরে আসিল; মাতাল কহিল "এই নাও।"

গৃহিণী, "কি লব?" না বুঝিয়া দুইজনকে পরম যত্নে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। সেইদিন গৃহিণীর যত্নে সেই গৃহে বাস।

পরদিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুসুমকলির ন্যায় উন্মীলিত-চক্ষু মাতাল, সৌদামিনীকে বলিল, "মা, ঘর ছেড়ে আর তুমি যেতে পাবে না। মেদিনীপুরে তোমার মনে পড়ে, একটা ছোঁড়া পালিয়ে এসেছিল। বাড়ীর লোকের বালাই বিদায় হ'ল জ্ঞান। মা বাপ ছিল না, এক কাকাবাবু। তিনি ছেলেটাকে পাওয়া যায় না ব'লে পার পেলেন। দেবেন্দ্রবাবু স্কুলে দিয়া আমায় উকিল করেছেন। বেশ দু টাকা পাই। মা, আমার মনে হ'চ্ছে, তুমিও ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্চ। এখন ধরে তোমায় ঘরে রাখি।" সোজা কথা—সৌদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল, সেই স্থানেই রহিলেন। একদিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে, সৌদামিনী জানেন না, সৌদামিনী যত্ন করিয়া বলিতে গেলেন,–"বাবা, তুমি আমার ছেলে।" মাতাল উত্তর করিল,–"তার হিসাব কি?" সৌদামিনী ভাবিলেন,–"একি উত্তর!" কিন্ত ভয় হইল না। মাতাল তখন ভাবিতেছিল যে নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে; বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে, তাহাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে। মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সেই নীরদ ইহারই সন্তান। এই কথা ভাবিতেছিল যে, কেমন ক'রে তাহাকে বাঁচাই; তাই উত্তর করিল,–"তার হিসাব কি?" যথার্থই সৌদামিনীর পুত্র নীরদ, বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা

ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিব। কিন্তু কি জানি, যখন তাহার উপর ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল,—খুন করিবার নিমিত্ত নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকিল, যে কথায় বুঝেন, এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসী যাইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকিল ভাবিতেছিল,–"দুর হ'ক, বালাইয়ে কাজ নাই, কাল আপিল করিব।"

দীপে দীপ নির্ব্বাণের ন্যায়, হৃদি বেদনায় হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী ভাব ব্যক্ত করে। সেই দিন ফাঁসীর দিন। রমণীর নিকট হৃদয় প্রমদা (মাতালের স্ত্রী) বলিল,–"মাগো, আজ তোমার নীরদের

ফাঁসী। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।"

উন্মাদিনী শুনিলেন, ক্ষণেক স্তম্ভিত হইলেন, রহিলেন না। —হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে, অতি দ্রুতপদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক্ নির্ণয় নাই, অথচ যে দিকে ফাঁসী হইতেছে, সেই দিকে চলিতেছেন। কোমল পদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। রুক্ষকেশ আকাশে দুলিল, পবনে বসন উড়িতে লাগিল; তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জনসমাগমে স্থান নাই। ফাঁসী দর্শনেচ্ছু নির্দ্দয়হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল। সকলে স্থান দিতে লাগিল। ঠিক ফাঁসীর সময়। উন্মাদিনী নিকটে উপস্থিত। কহিলেন,–"নীরদ, আমি অসতী নহি।"

নীরদ ফাঁসীতে ঝুলিল। উন্মাদিনীর কথা কাণে গেল কিনা জানি না। উন্মাদিনী সেই স্থানেই মরিলেন।

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়াছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়ীতে লইয়া আসিল।

যথা নিয়মে সৌদামিনীর সৎকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকিলের কৌশলে পিতৃ-অর্জ্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই ফাঁসী ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুম্বন করিতে করিতে বলিত,–"মা আমায় এইরূপে চুম্বন করিতেন।"

সুখ ও দুঃখ

—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নিত্যানন্দের পুত্রের নাম রামহরি—উভয়েরই চিত্রকরের ব্যবসায়; নিত্যানন্দ যেরূপ দুর্গোৎসবের চালচিত্র করিত, এরূপ আর কেহ পারিত না, কিন্তু পূজার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাহার কাজ জুটিত না। সুতরাং অন্নকষ্টও ঘুচিত না। রামহরি বিশ্বকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশ-কর্ম্মা; চালচিত্র ছোট কাজ বলিয়া রামহরি তাহা করিত না। রামহরি পট প্রস্তুত করিত, বউ বসিয়া মাছ কুটিতেছে, ফুলবাবু আলবোলায় তামাক খাইতেছে, ইত্যাদি চিত্রকার্য্যই রামহরি ভালবাসে। এতদ্ভিন্ন রামহরি গাছপালা জীবজন্তু ইত্যাদি আঁকিত; দোষের মধ্যে চিত্রের নিম্নভাগে গাছের নাম কিম্বা জন্তুর নাম না লেখা থাকিলে কেহই টের পাইত না যে, এ গাছটি বা জন্তুটি কি? রামহরি হয়তো গোলাপ ফুলের একটি একটি পাপড়ি এক এক পৃথক রঙ্গে রঞ্জিত রাখিয়াছে, লোকে যদি বলে এরূপ করা ভাল হয় নাই, রামহরি হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। রামহরি আর্টস্কুলে পড়িয়াছিল। সেখানে শিখিয়াছিল কার্পেট আসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে সমস্ত এক রং হইলে ভাল হয় না, অতএব গোলাপ-ফুলে সমস্ত দল এক রঙ্গের হইলে কেন ভাল হইবে? এটা সুতরাং রামহরির দোষ নহে। সে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাই করিতেছে। যদি ইহাতে কাহারও দোষ থাকে, সে প্রকৃতির। প্রকৃতি কেন লেখাপড়া শেখেন নাই? সমস্ত ঘাস কেন সবুজ হইবে? জবাফুলের কেন সমস্ত দলগুলি লাল হইবে? বেলফুলের কেন সমস্তই সাদা হইবে? প্রকৃতিতে এরূপ আছে, কিন্তু রামহরি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পড়িয়াছে। সে কেন প্রকৃতির নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে? সঙক্ষেপতঃ রামহরি যেরূপ চিত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহই ভাল বলিত না। সুতরাং রাশি রাশি পট ঘরে জমিয়া গেল, কেহই কেনে না। রামহরির মনে সংস্কার এই যে একবার একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাইবে। ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যদিও রামহরির পিতার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু বুড়ো কষ্টে শ্রেষ্টে যে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ,তাহাতেই রামহরির সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। তাহার পট কেহ খরিদ করুক আর না করুক, তাহাতে তাহার দৃক্‌পাত নাই; মনের হরষে যাহা ইচ্ছা, তাহাই চিত্র করিতেছে এবং বিক্রয় হইতেছে না বলিয়া সমস্তই জমা করিয়া রাখিতেছে; একদিন না একদিন অবশ্যই বিক্রয় হইবে।

নিত্যানন্দের সঞ্চিত টাকাগুলি না ফুরাইতে ফুরাইতে রামহরির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল; নিজের পরমায়ু ও অপরের মন কেহ কম দেখে না। কন্যা সুখে থাকিবে বলিয়া রামহরির স্বজাতীয় একজন মুদী নিজ কন্যা রামহরিকে দান করিল; রামহরি বিবাহ করিয়া পরম সুখী হইল; অল্পদিনের মধ্যেই রামহরি পুন্নাম নরকত্রাতার মুখাবলোকন করিল এবং তদ্দর্শনে যারপরনাই সুখী হইল।

এদিকে বাপের সঞ্চিত টাকাগুলি ফুরাইয়া আসিল; এমন কি, পুত্রকে দুগ্ধ কিনিয়া দিবে এরূপ কিছু রহিল না। নিজে যাহা কিছু চিত্র করে, তাহা বিক্রয় হয় না; অবহেলা করিয়া চালচিত্রের কাজ শেখে নাই, সুতরাং পূজার সময়ও কিছু পায় না। কি করে; শ্বশুরের মুদীখানার দোকান হইতে চাল ডাল ধারে খরিদ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুর মনে করিল, সত্বরই টাকা পাওয়া যাইবে। কতক সেইজন্য, কতক নিজের কন্যার খাতিরে সে ধার দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যখন দেখিল টাকা পাইবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন সেও ধার বন্ধ করিল।

এদিকে যত অন্নকষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, রামহরির স্ত্রী ততই স্বামীকে গঞ্জনা দিতে লাগিল। যে স্বামী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল, তাহাকে দেখিলে পুঁটি (রামহরির স্ত্রীর নাম পুঁটি) এক্ষণে শতমুখী (ঝাঁটা) লইয়া আইসে। রামহরির ঘরে থাকিবার গো নাই— বাহিরেও যাইতে পারে না। রাস্তায় দেখিলে পাঁচশ পাওনাদার আসিয়া রামহরিকে ধরিয়া ফেলে। রামহরি কি করিবে ভাবিয়া পায় না; সর্ব্বদুঃখনিবারণী সুরাই এক্ষণে একমাত্র অবলম্বন হইল। আজ কাপড়খানি, কাল পুরাতন বাক্সটা ইত্যাদি গৃহে যাহা ছিল, একে একে বিক্রয় করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল। একদিবস একখানি র‍্যাপার বিক্রয় করিয়া অন্যান্য দিবসাপেক্ষা অধিক পয়সা পাইল, সুতরাং অধিক মদও খরিদ করিতে পারিল। রামহরি সমস্ত একেবারে সেবন করিয়া বাটী আসিল। এস্থলে বলা উচিত যে, প্রথম প্রথম রামহরির স্ত্রী খালি শতমুখী দেখাইত মাত্র, কিন্তু ইদানিং শতমুখী প্রহার করিতে শিখিয়াছে। রামহরি অকাতরে সুরেশ্বরীর বরে সমস্ত বরদাস্ত করিয়া থাকে।

অদ্য র‍্যাপার বেচিয়া মদ্যপান করিয়া আসিয়াই চিত্র করিতে বসিল। এমন সময় সে দেখিল একখানি থালায় করিয়া এক থালা সন্দেশ ও তাহার উপর একখানি কাপড় লইয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া 'রামহরিবাবু, রামহরিবাবু' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রামহরি দরজা খুলিয়া সন্দেশ থালাটি ও কাপড়খানি লইল। রামহরি জানিত, এ তত্ত্ব তাহার জন্য আইসে নাই, রাস্তার অপর পারের রামহরি দত্তের জন্য আসিয়াছে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করিয়া বৃদ্ধাকে কহিল—"একটু পরে এসে থালা নিয়ে যেও।" বৃদ্ধা চলিয়া গেল। রামহরি উদর পুরিয়া সন্দেশ খাইয়া থালাখানি লইয়া মদের দোকানে গেল। দোকানদার থালার পরিবর্ত্তে মদ দিতে চাহিল। রামহরির অদ্য আর মদের প্রয়োজন নাই, সে থালার পরিবর্ত্তে টাকা চাহিল। দোকানদার তখন একটি সিকি রামহরির হাতে দিল। রামহরি চারি আনা লইবে না, দোকানদারও অধিক দিবে না, তখন রামহরি থালা ফিরিয়া

চাহিল। দোকানদার কহিল,–"যদি থালা ফিরিয়া চাও, তবে কনেষ্টবল ডাকিয়া ধরাইয়া দিব।" রামহরি কি করে, অগত্যা সেই সিকি লইয়া গেল, কিন্তু বাটী না আসিয়া এক পেরমায়ার দোকানে প্রবেশ করিল। যখন অবস্থা ভাল ছিল, তখন রামহরি মধ্যে মধ্যে এ আখড়ায় আসিত।

অদ্য রামহরির গ্রহ এরূপ সুপ্রসন্ন যে এক ঘন্টায় মধ্যেই সেই চারি আনায় ৪০ টাকা পাইল। তখন রামহরি ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু যাহাদিগের সহিত খেলিতেছিল তাহারা আসিতে দিল না; সুতরাং রামহরি খেলায় বসিল।—রামহরির গ্রহ পূর্ব্ববৎ সুপ্রসন্ন—রামহরি যে তাস ধরে, তাহাতেই রামহরির জিত হয়; উঠিয়া আসিতে চাহিলে আসিতে দেয় না। এরূপে সমস্ত রাত কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে গণনা করিয়া দেখিল, রামহরির ৪০০ টাকা জিত হইয়াছে।

রামহরি আর যে যে কুকর্ম্ম করুক, কিন্তু কখনও চুরি করে নাই; সুতরাং পর দিবস রামহরির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অপর টাকাগুলি প্রথমতঃ সাবধান করিয়া রাখিয়া দুইটি টাকা ট্যাঁকে করিয়া সেই মদের দোকানে গিয়া কহিল,–"তোমার পয়সা নাও; আমার থালা ফিরিয়া দাও।" দোকানদার দিতে চাহে না। রামহরি একটাকা পর্য্যন্ত উঠিল, দোকানদার তাহাতেও থালা ফিরাইয়া দেয় না। থালাখানি রূপার, রামহরি পূর্ব্বদিবস মত্ত থাকায় টের পায় নাই, কিন্তু দোকানদার তাহা জানিতে পারিয়াছে, এই জন্যই সে ফিরাইয়া দিতে অসম্মত। রামহরি উপায়ান্তর না দেখিয়া কনষ্টেবল ডাকিতে প্রস্তুত হইল। কহিল, সে নেসার ঘোরে এ কাজ করিয়াছে, এক্ষণে যাহার জিনিস, তাহাকে দিতে প্রস্তুত আছে এবং তজ্জন্য চারিগুণ দাম দিতে চাহিতেছে। দোকানদার তখন ভয় পাইয়া রামহরির থালা ফেরৎ দিল; রামহরি থালাখানি রূপার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু রূপার থালা দেখিয়াও রামহরির মনে লোভ হইল না। সে থালাখানি লইয়া যাহার থালা, তাহাকে দিল। কহিল, ভ্রমক্রমে সে তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কাপড়খানিও ফেরৎ দিল। যাহার থালা, সে সহজেই রামহরির কথা বিশ্বাস করিল।

রাত্রি হইলে রামহরি পুনরায় খেলার আড্ডায় গেল এবং পুনরায় বিস্তর টাকা জিতিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই রামহরি একজন বিলক্ষণ ধনবান্ লোক হইল।—উত্তম বাটী প্রস্তুত করিল এবং স্ত্রীর গায়ে ধরে না এত অলঙ্কার দিল; দাস-দাসী হইল, গাড়ি-ঘোড়া হইল, রামহরির বাড়ীতে এখন কত লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকেরি মনে ধারণা এই যে, রামহরি পোঁতা টাকা পাইয়াছে। কেহ কেহ বলে, রামহরি রাত্রিতে চুরি করে! দু-একজন রামহরির বাটীতে রাত্রে আসিয়া রামহরির দেখা পায় নাই। ইহাদিগের মনে গাঢ় সংস্কার, রামহরি নিশ্চয় চুরি করে! যে যাহাই বলুক, রামহরির খাতিরের ত্রুটি নাই। অর্থের এমনি গুণ, যেরূপে ঘরে আসুক না, একবার আসিলে তাহার মর্য্যাদা কোথাও যায় না। রামহরির স্ত্রী আবার মিষ্টভাষিণী হইল এবং রামহরিও পত্নী-বৎসল হইল। এমন কি পাড়ায় দাম্পত্য-প্রণয়ের কথা উপস্থিত হইলে সকলেই

রামহরি ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিত। কিন্তু পৃথিবীর কোন দ্রব্যই চিরস্থায়ী নহে, সুখ কেন চিরস্থায়ী হইবে? রামহরির ধনের কথা ক্রমে ক্রমে পুলিশের কর্ণগোচর হইল। রামহরি জানিতে না পারে, এরূপ ছদ্মবেশে রামহরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলিশের লোক ফিরিতে লাগিল। কিন্তু এখন রামহরি আর তত খেলার আড্ডায় যায় না, কারণ, রামহরির সহিত কেহ খেলিতে চায় না, রামহরির এতই জিত হয়। মাঝে মাঝে বড় খেলয়াড় আসিলে ডাক পড়ে।

এইরূপ একদিবস একজন বড় খেলয়াড় আসিলে রামহরির ডাক হইল। রামহরি সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া খেলিতে যাইতেছে—দুজন কনষ্টেবল রামহরির অজ্ঞাতসারে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রামহরি খেলার আড্ডায় প্রবিষ্ট হইলে আর দুজন কনষ্টেবল আসিয়া জুটিল। একুনে চারিজন হইল। ইহার দুইজন দ্বারে রহিল, আর দুজন গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। খেলিবার সময় রামহরি দ্বারের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। কনষ্টেবল দুইজন প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রে রামহরি টের পাইল; সে তাস ফেলিয়া পলাইল। কনষ্টেবলেরা মনে করিল, দ্বারে যে দুজন কনষ্টেবল আছে, তাহারা তাহাকে ধরিবে। এই ভাবিয়া আর তিনজনকে তাহারা ধৃত করিল; কিন্তু খেলার আড্ডার ঘরে প্রবেশ করিবার আর একটি গুপ্ত দ্বার ছিল, রামহরিকে সেইদিকে যাইতে দেখিয়া একজন কনষ্টেবল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু রামহরিকে ধরিতে পারিল না। যখন দেখিল আর দৌড়ান বৃথা, তখন কনষ্টেবল তাহার নিজের হাতের ব্যাটন (Baton) রামহরির পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। রামহরি বেদনায় চক্ষু মেলিয়া দেখিল, কোথায় বা কনষ্টেবল আর কোথায় বা কি! তাহার স্ত্রী তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া শতমুখী প্রহার করিতেছে।

"সর্ব্বনেশে, লক্ষ্মীছাড়া, তুমি কাজ ফেলে ঘুমুচ্ছো? কি খাবে তার ঠিক নেই, ঘরে চাল নেই, তবু মদ না খেলে হয় না?" নয়ন উন্মীলনমাত্র এই কথা তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় রামহরির আর কোনই সন্দেহ রহিল না। সুরা সেবন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় যে রামহরি স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না।

পাঠককে বলা বাহুল্য যে রামহরি নেশার ঘোরে নিদ্রিত হইয়া এ সমস্ত সুখ স্বপ্নেই উপভোগ করিতেছিল।

বস্তুতঃ সকল সুখ দুঃখই স্বপ্নবৎ।—এই স্বপ্ন কাহারও অল্পক্ষণ স্থায়ী, কাহারও অধিকক্ষণ স্থায়ী।

ভজহরির বিয়ে

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ, ভজগোবিন্দ, গুরুগোবিন্দ, ভজহরি, কৃষ্ণহরি, রামহরি, পঞ্চু ন্যায়চুঞ্চু, হাবু বিদ্যালঙ্কার, গোবর্দ্ধন শিরোমণি, কেংলু, নীলুচাকর—সকলেই পাকা মেম্বর। আড্ডা ভারি গুলজার—মহা সরগরম। কেউ গাঁজা টিপ্‌চে, কেউ আগুন চড়াচ্ছে, কেউ নলচে ফাটাচ্ছে, কেউ দম মেরে ভোঁ হয়ে বসে আছে, কেউ রাজা উজির মার্চ্চে ;—ধুমে ঘর অন্ধকার। গান বাজানা, নৃত্য—খোস গল্প—সকলেরই হৃদয়ে যেন সুখের সাগর উথলে উঠছে!

ভজহরি একজন সর্দ্দার মেম্বর—সকলেরই খুব প্রিয়। গরিবের ছেলে। বাড়ীতে এক বিধবা মা—আর ত্রিকুলে কেউ নাই। একদিন দুপুর বেলা বাড়ীতে ভাত খেতে গেলে, মা চোখের জল মুচতে মুচতে বল্লেন "ভজ! তুই গাঁজা খেয়ে একেবারে ব'য়ে গেলি। এখন ডাগর ডোগরটি হয়েছিস, আজও তোর বোদ সোদ হ'ল না? কত সাধ ছিল—মনে করেছিলুম তোর বে'টি দিয়ে, বউটির মুখ দেখে মোর্ব্বো, আমার কপালে তা হ'ল না! কে তোকে মেয়ে দেবে? গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দে, মেলা কল হয়েছে, কাল একটা কলে যা। দু টাকা আন্তে পাল্লে আমার যে রূপার পঁইছে আছে, বেচে কিনে তোর বে'টি দিয়ে বউটি এনে দিন কত সুখের ঘর করি।"

"বউ" কি মজার জিনিস! বউর নাম শুনে ভজর মনে সুখের তরঙ্গ উছলে উঠলো। ব'ল্লে "মা! তুমি আর দু:খু করো না, আমি আর গাঁজা খাব না। কাল সকালই কলে যাব যাতে টাকা রোজগার হয় তার চেষ্টা কর্ব্বো।"

এই বলে পেটটি ভরে বেশ ক'রে খেয়ে দেয়ে ভজ ঘরে গিয়া শয়ন করিল, এপাশ ওপাশ কত পাশ ফিরিল, ঘুম আর আসে না। পুঁথিগত বিরহিণীর ন্যায় তাহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত—মনটি আডডায় পড়ে—কেমন করেই বা ঠাণ্ডা হবে! ক্রমে প্রাণটি যেন ঠোটের আগায় এল। গা দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। শুয়ে থাকা ভার হয়ে উঠ্‌লো, ভাবতে লাগলো,—"গাঁজা খাব না, বেশ; কিন্তু দূর থেকে দেখে আস্তে দোষ কি। মরি মরি আড্ডায় এখন কত মজা—কত ইয়ারকি উড়ছে, হাবাতের কপালে সুখ নাই। যাহোক চুপি চুপি একবার গিয়ে দূর থেকে দেখে আসি।"

এই ভেবে ভজ আস্তে আস্তে উঠিয়া আড্ডার অভিমুখে চলিল। বাগানের ভিতর

আড্ডাঘর, চারিধারে পগার। দূর থেকেই ভজাই আনন্দের নৃত্যের ও গীতের ধ্বনি শুনিল; ভাবে গদ গদ—চক্ষে দু এক ফোঁটা জলও আসিল—তার কপালে আর ও সুখ নাই; মা কলে যেতে বলেচেন। না গেলে বউ পাবে না। দুঃখে যেন বুক ফেটে গেলো। চুপি চুপি সেই পগার পাড়ে বসিয়া সঙ্গীদের নাচ তামাসা দেখ্‌তে লাগলো। কিন্তু তেমন করে কে কতক্ষণ থাক্তে পারে—পাথরে কার বুক বাঁধানো? ভজাই উঠিল—মনকে ডেকে বলিল, 'বেশ খাব না, কিন্তু দেখ্‌তে কি দোষ, দেখতেই বা মানা কি।'

ভজাই সকলের অতি প্রিয়, আজ এতক্ষণ যে ভজাই আসে নাই, আড্ডা যেন অন্ধকার, সকলের মুখেই ভজাইয়ের কথা। কি হয়েছে? ভজাই কেন এল না? এমন সময় মলিন মুখে ভজাই তথায় উপস্থিত! অমনি সকলে ধরে ভজাইকে টানাটানি—কাঁধে করে নিয়ে নৃত্য। চাঁদের উপর থেকে যেন মেঘ সরিয়া গেল সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কেউ গাঁজা সাজিয়া আনিয়া দেয়, কেউ কোলাকুলি করে, মহা আনন্দ পড়ে গেল।

ভজহরির কিছুতেই সুখ নাই,—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো, বল্লে—"ভাই আর আমি গাঁজা খাব না, আর এখানে আসবো না; তোমরা আমাকে বিদায় দেও।" ভেউ ভেউ ভেউ করিয়া ভজাই কেঁদে আকুল।

ভেউ ভেউ ভেউ—ভজাইয়ের কান্না দেখে সকলেই কাঁদিতে—আরম্ভ করিল। কে কারে থামায়, কে কারে বুঝায়, কারণ কি, কেই বা জিজ্ঞাসা করে।

কতক্ষণ পরে দোলগোবিন্দ কান্না ফেলে লাফিয়ে উঠে ভজাইকে কাঁধে করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বল্লে—'ভজাই! তুই বয়ে গেলি নাকি? গাঁজা খাবিনি! এই নে ধর্‌ গাঁজা, মার্‌ দম।'

অমনি আবার সকলেই নেচে উঠ্‌লো—সকলেই গাঁজা সেজে এনে ভজাইকে ধরে টানাটানি, 'ভজাই গাঁজা খা। তুই কি একেবারে অধঃপাতে গেলি।'

ভজাই কাঁদ কাঁদ ভাবে আবার বল্লে—"না ভাই আমি আর গাঁজা খাব না। মা মানা করেছেন, কাল আমি কলে যাব, টাকা আন্‌বো, মা বে দেবেন বলেছেন, বউ এনে ঘর কত্তে তাঁর বড় সাধ হয়েছে। তোমাদের কি ভাই, আমি গরিবের ছেলে, টাকা না হলে বে হবে না।"

দোলগোবিন্দ গাঁজায় দম মেরে হুঁকা ভজর হাতে দিয়ে হেসে বল্লে "দূর্‌ বোকা! বে কর্ত্তে কি টাকা লাগে? নে ধর্‌, গাঁজা খা। সাম্‌নে রোব্‌বার তোর বে হবে। সে জন্যে আর ভাব্‌না কি? বের জন্যে তুই গাঁজা খাওয়া ছাড়বি!"

অমনি ভজাই গাঁজা টানিল—ধোঁয়ে চারি দিক ধোঁয়াকার। একশো ছিলিম গাঁজা উড়িল। চারিদিকে হাততালি পড়ে গেল। নাচ গানের তো কথাই নাই। আড্ডা খুব জেঁকে উঠিল।

পরদিন রাত পোহাল। সকলে তাড়াতাড়ি দুটি নাকে মুখে গুঁজে মেয়ে খুঁজ্‌তে চলিল। ভারি আমোদ—ভজর হৃদ্‌মাঝারে মহা তুফান—দোলগোবিন্দ বলেছে, সাম্‌নে রোব্‌বার তোর বিয়ে! এ আনন্দ আর কি রাখ্‌বার জায়গা আছে! ভজ, ভাবে গদ গদ—গাঁজায় তর্‌।

এগাঁ সেগাঁ ওগাঁ বেড়াইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় সকলে দশ ক্রোশ দূরে কাণাই গ্রামে পৌঁছিল। তথায় কসাই ঠাকুর নামে এক চক্রবর্ত্তীর একটি পনর বছরের মেয়ে আছে। কসাই ঠাকুর আহারান্তে তামাক খাইতেছেন, এমন সময় সকলে তাঁর বাটীতে উপস্থিত। মেয়ে দেখ্‌তে এসেছেন, শুনে কর্ত্তা বাবু গুমরে মুখ ভারি করে বল্লেন "মেয়ে একটি আছে সত্য। কিন্তু সে মেয়ে বে করা তোমাদের কাজ নয়।"

দোলগোবিন্দ বলিল,—"মশাই! কাজ নয় কি না তা আপনি কেমন করে জান্‌লেন?

কানাই। "ওহে বাপু, এতে ঢের টাকা চাই—বে অমনি হয় না। এলে, আর পনর বছরের মেয়ে বে করে গেলে, তা হয় না।"

দোল। "ভাল, কি দিতে থুতে হবে, তাই কেন বলুন না। আমরা পরে বিবেচনা কর্ব্বো।"

কর্ত্তাবাবু তামাক টান্‌তে টান্‌তে বল্লেন—"ওহে বাপু বলে কি হবে! তোমাদের মতন অনেকেই এসে এসে ফিরে গেছেন—মিছে বলে কি হবে! এটি আমার ছোট মেয়ে, বড় আদরের—বড়টিকে দেড় হাজার টাকায় পার করেছি। এই আদরের মেয়েটিকে দুই হাজারের একটা কাণাকড়ি কমে ছাড়বো না! শুন্‌লে, টাকা আছে?—আমি আর বল্‌তে পারি না। একটু শয়ন কর্ত্তে হবে।"

কর্ত্তা উঠে যান, পঞ্চু ন্যায়চুঞ্চু বল্লেন,—"মশাই! বসুন বসুন। দুট কথা ত শুনুন। আমরা সত্যি ফিরে যেতেও আসিনি, খেলা কর্ত্তেও আসিনি। মেয়েটিকে দিতে হবে।"

কর্ত্তা চটে একটু উচ্চস্বরে বল্লেন,—"তুমি বল্লেই কি মেয়ে একটা অমনি হয়? না এখন আর বক্‌বার সময় নাই, তোমাদের যত মুরদ তা টের পেয়েছি।"

দোলগোবিন্দ বলিল "মশাই চটেন কেন। কিছু কম করুন, তাহলেই হবে।"

"এক পয়সা কম করিব না। তোমরা যাও যাও—এ আমার অতি আদরের মেয়ে। এত বড় মেয়ে আর কোথা পাবে বল দেখি? দুপয়সা যদি না পাব, তবে এত খাইয়ে দাইয়ে এত ডাগর কল্লুম কেন? মেয়ে ভেসে আসে, বটে?"

পঞ্চুন্যায়চুঞ্চু বল্লেন "তা মশাই! যা বল্লেন, সব সত্যি বটে, যাহোক দেড় হাজার পর্য্যন্ত আমরা দিতে পারি। আপনার কি মত বলুন?"

কর্ত্তা খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন—"না তা হবে না। আরো কিছু বেশি চাই। তোমাদের খাতিরে আমি একশত টাকা ছেড়ে দিতে পারি। এক হাজার নয় শত টাকার এক কড়া কমে হবে না। ওরে বাবুদের তামাক দে।"

কর্ত্তা এতক্ষণ মনে করেছিলেন এরা এত টাকা দিতে পার্ব্বে না। তামাকেরও নাম হয় নাই। আপনিই মজাকরে খাচ্ছিলেন। এখন দেখ্লেন এরা যে সে নয়; অমনি তামাক ডাকিলেন। কিন্তু দেবে কে? ডাক্লেন ঐ পর্য্যন্ত।

অনন্তর অনেক বকাবক্কি, দরদস্তর, কসা মাজা করে দেড় হাজার দরেই বে ঠিক হল। আর আস্‌চে রবিবার ২২শে কার্ত্তিক বিয়ে হবে, তাও ধার্য্য হল। এ খের আর কালা-কাল। একদিকে ভজহরি—তার যখন হয়, একটা বে হলেই হল, যেহেতু তার কোন পুরুষেই কারো বে হয় নাই। তার ঠাকুর দাদারা পাঁচ ভাই—চার ভাই আইবুড়ো বুড়ো হয়ে মরেন, কাকা জেঠা, আট ভাই—৭ জন আইবুড়ো বুড়ো হয়ে মরেন। তার আবার দিন অদিন কাল আর অকাল। ওদিকে কর্ত্তা বাবুর টাকা হলেই হল।

দিনস্থির করে সকলে চলে গেলেন।

রবিবার আসিল। আড্ডা ভারি সরগরম। ভজার গায়ে হলুদ। হুলুধ্বনিতে চারিদিক স্তব্ধ—গাঁজার ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন। যথা সময়ে আইবুড়োভাত হল। সকলের মহাআনন্দ। ভজ পৃথিবী সরাখানা দেখ্‌চে।

দোলগোবিন্দ মার আদরের ছেলে। নাই পেয়ে সে একপ্রকার বয়ে গেছে। তার মার হাতে কিছু পয়সাও আছে। খেতে গিয়ে মাকে ধরিল—যা মুখে আসিল বলিয়া গালি দিল। হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ করিল—তাকে একশো টাকা দিতে হবে, মা কি কর্ব্বেন, একশো টাকা দিলেন।

দোলগোবিন্দ টাকা পেয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আড্ডায় গেল। আর ভয় কি। টাকার যোগাড় হয়েছে। সকলেই দোলকে ধন্যি ধন্যি বলিল।

বেলা দুইটার সময় সকলে মহাসমারোহে বাজনা বাদ্দি, পাল্কি বেহারা, একমোণ চিঁড়ে মুড়কি, আধমোণ দই, দুই শত কলাপাত, পাঁচসের গাঁজা নিয়ে বে দিতে চলিল। আমোদ দেখে কে?

রাত দশটার সময় অর্দ্ধেক পথ গিয়া সকলে এক ঠাঁই আড্ডা গাড়িল। মুহুর্মুহু গাঁজা চলিল। ধোঁয়ে চারিদিক অন্ধকার করিল। ভজর আর সে আহ্লাদ নাই—তার প্রাণ ধড় ফড় কর্চ্চে। যত রাত্রি হচ্চে—দেরি হচ্ছে ততই তার মন কেঁদে কেঁদে উটচে—ভয় হচ্চে। "ভাই গোধূলি লগ্নে বে, আর দেরি করো না।" এই কথা বলে কেবল সকলকে খ্যাচ্‌কাচ্চে।

এদিকে গোধূলি লগ্নে বে। কর্ত্তা অনেক টাকা পাবেন—ভারি খুসি; আয়োজন একরকম করেচেন—আদরের মেয়ে নাই বা কর্ব্বেন কেন। ক্রমে রাত হল। বরের দেখা নাই। মেয়ের গায় হলুদ হয়েছে, বে দিতেই হবে, না দিলে জাত যাবে। মহা-বিপদ। এই আসে এই আসে করে রাত দশটা বাজিল, কাহারও দেখা নাই। কর্ত্তার মাথা ঘুরে গেল—জাত যাবে বলে নয়, পাছে টাকা গুনো মারা যায় এই ভয়ে। কামিনী, ভামিনী, গোলাপ, আতর, কুমুদ, নিস্তারিণী, তরঙ্গিণী—যত সব রসবতী নারী বাসর

জাগ্‌বে বলে এসে আসর করে বসেছিল। হতাশ হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে একে একে ঘরে ফিরে গেল। কর্ত্তার মুখে কেবল "সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল।" দেড় হাজার টাকা —!" এই কথা। পুরুৎঠাকুর ও পাড়ার আর আর মুরুব্বিগণ এসে বল্লেন,—"তা যখন কন্যার গায় হলুদ হয়েছে, বে দিতেই হবে। জাতটে তো রাখা চাই। তা আপনি এই গ্রাম থেকেই একটি পাত্র খুঁজে এনে বিয়েটি দিন। ওপাড়ার ঐ কেনারাম চক্রবর্তী আছে, সে না হয়, ঘোষালদের শান্তিরাম আছে—তারা ছেলে মন্দ নয়। যারে হয় একটিকে এনে কন্যা সমর্পণ করুন। জাত কুল সব বজায় থাকবে। এর আর ভাবনা কি! আপনি এত অধৈর্য্য হবেন না।"

কর্ত্তা রেগে টং। "আমার মেয়ে—আমার জাত, আমি বুঝবো। আমি তো তোমাদের সালিসি ডাকি নাই—তোমাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমাদের মতন গণ্ডমূর্খ —আহাম্মক আমি দুনিয়ায় দেখি নাই। আমি কি জাতের জন্যে ভাব্‌চি—না বের জন্যে ভাব্‌চি? দেড়টি হাজার টাকা যায় তার উপায় কি বল দেখি? সেজে গুজে বড় কর্ত্তানো কোর্ত্তে এসেছ!"

দিগম্বর ভটাচার্য্য বল্লেন,—"মশাই, পাগল হলেন নাকি! আপনি বুদ্ধিমান, প্রাচীন, এখন কি টাকার ভাব্‌না আগে, না—কিসে জাতকুল থাক্‌বে তার ভাবনা আগে। আপনি কেনারামের ছেলে তিনকড়ির সঙ্গে মেয়েটির বে দিন। সে বেশ সুপাত্র।"

কর্ত্তা রেগে বল্লেন,—"তোমরা আমাকে আর জ্বালিও না। আমি তো তোমাদের ডাকি নাই। যদি কোথার বরাৎ থাকে যাও। আমি মেয়ের বে দোব না। আমার জাত যাবে তা তোমাদের কি? আমি কি জন্যে খাইয়ে দাইয়ে মেয়েটিকে পনর বছরের করিছি বল দেখি! আহা আদরী আমার বড় আদরের ধন—আমি তারে জলে ফেলে দিতে পার্ব্বোনা। দেড় হাজারের এককড়ি কমে এ মেয়ে আমি ছাড়বো না। তা জাতই যাক আর কুলই যাক।"

কত লোকে কত বুঝাইল—কত শাস্ত্র কথা উঠিল। কর্ত্তা কিছুতেই রাজি হলেন না। রাত্রি বারটা বাজিল। দেখে শুনে পুরুৎ ম্লানমুখে ঘরে ফিরে গেলেন, তাঁর বিদায়ের টাকা মারা গেল। ফলারে ব্রাহ্মণ গাল দিতে দিতে ফিরে গেল। ফচ্‌কে ছোঁড়ারা হাততালি দিয়ে ধুলো ছড়াতে ছড়াতে—ছড়া বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে চলে গেল। কর্ত্তাও গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্দরে গেলেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়লেন। বে-বাড়ী নীরব।

রাত পোহায় পোহায় কর্চ্চে এমন সময় চুপে চুপে দোলগোবিন্দরা দলে বলে বর নিয়ে নিঃশব্দে এসে উপস্থিত। রাত্রি জেগে—গোলমালে গ্রামের ও বে বাড়ীর সকলেই অকাতরে ঘুমুচ্চে। নীলু চাকর পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দরজা খুলে দিল, সকলে ভিতরে গিয়ে উঠানে, রকে—স্থানে স্থানে সঙ্গে যে সকল কলাপাত ছিল পাতিয়া

দই চিঁড়ে মাখিয়া খাইল—ছড়াইল এবং পরিশেষে পাতাগুলা বাড়ীর চারিদিকে ফেলিল।

যেন বে হয়ে চুকে বুকে গেছে এই ভাবে ভজহরিকে সাজাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া আপনারা পাশে বসিল। সঙ্গে তামাকত ছিলই—মুহুর্মুহু গাঁজা ও তামাক চলিতে লাগিল। সকলেই বেশ ভদ্রলোক বিজ্ঞ পঞ্চুন্যায়চুঞ্চু, গোবর্দ্ধন শিরোমণি ও হাবু বিদ্যালঙ্কার, চতুর দোলগোবিন্দ—কে এক কথা বলে যায়?

সকাল হল। পুরুৎ ঠাকুর টাকাটা মারা গেছে—মন উস খুস কর্চ্চে, ঘরে থাক্তে পাল্লেন না, রাত পোয়াতে তাড়াতাড়ি দেখতে এলেন বের কি হ'ল। দোলগোবিন্দ আকার প্রকার ভাবভঙ্গি দেখে ঠিক ঠাউরে সসম্ভ্রমে উঠে নমস্কার কল্লে—বরও তাড়াতাড়ি পদধূলি লইল।

তখন পুরুৎ ঠাকুরকে সমাদরে বসাইয়া দোলগোবিন্দ বলিল "মশাই আসুন আসুন—বস্‌তে আজ্ঞা হয়। আপনি মনে কর্ব্বেন না আমরা আপনার টাকা মার্ব্বো। আমরা সেরূপ লোক নই। আপনি থাকুন আর নাই থাকুন আপনার পাওনা গণ্ডা কোথা যাবে। এই ধরুন—আমরা দরিদ্র—তবে যথাসাধ্য আপনার সম্মান রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ দিতেছি, গ্রহণ করুন বলিয়া ৫ পাঁচটি টাকা পুরুতের হাতে দিলেন। পুরুৎ একটি কি দুটি টাকা পাইতেন—একেবারে পাঁচ টাকা! পুরুতের বুক বার হাত—হাতে যেন স্বর্গ পাইল। দোলগোবিন্দরা তাঁহার চক্ষে সাক্ষাৎ ভদ্রতার মূর্ত্তি! পুরুৎ ঠাকুর কত আশীর্ব্বাদ—কত ধন্যি ধন্যি কল্লেন।

এ কথা সে কথার পর হাবু বিদ্যালঙ্কার বল্লেন "কিন্তু মশাই! সে যা হোক, কর্ত্তা মশাইয়ের রীত চরিত্র দেখে আমরা অবাক হয়েছি। আমরা ভদ্রসন্তান—উনিও বিজ্ঞ, প্রাচীন ও ভদ্রসন্তান—বিশেষ এখন আমরা কুটুম্ব, আমাদের সঙ্গে এরূপ ব্যাভার করা ভাল নয়। পারাপারের পথ, বুঝ্‌তেই পারেন,—আমাদের নদীর কূলে উপস্থিত—আর ঝড় বলে কোথা ছিল—বড় বড় গাছ আমাদের চোখের ওপর ভেঙ্গে পড়্‌লো! পার হই কেমন করে, সুতরাং বিলম্ব হলো। আপনারাও চলে গেছেন, আমরাও তার পর উপস্থিত হয়েছি। যাহা হউক, শিরোমণি মশাই ছিলেন, তাই কোনরূপে বেটা হয়ে গেল, আপনাকে আর কষ্ট দিলাম না। কর্ত্তা মশাইকে কথামত দেড় হাজার টাকা গুণে দিলাম,—এখন তিনি দেরি হওয়ার দরুন আরো দুই শত টাকা চান! আপনি ত বিবেচক বলুন দেখি, এটি কি অন্যায় কথা নয়? কর্ত্তা বলেন আর দুইশো না দিলে তিনি কখনও কোনে পাঠাবেন না! কি অন্যায়! আমাদের কাছে যে টাকা নাই এমন কথা নয়, বলি আপনারা পাঁচজন আছেন, আপনাদেরও ত সম্মান রাখা চাই!"

পুরুৎ ভট্‌চাজ্জি বামুন—চালকলালোভী—তাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম কাণ্ডজ্ঞান কোথা! পাঁচটা টাকা পেয়েছেন। এখন তিনি অনায়াসে তাঁরা তুলসী গঙ্গাজল হাতে করে বল্‌তে পারেন, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে বে দেছেন। হাবুর কথা শুনে চটে লাল্—হাত নেড়ে—টিকি নেড়ে বল্লেন "আমি জানি কর্ত্তার ঐরূপ স্বভাবই বটে—কিন্তু গাঁয়ে কি

ভদ্রলোক নাই, তিনি যা ইচ্ছে—তাই কর্ব্বেন! এমন না হলে লোকে কসাই ঠাকুর বল্‌বে কেন! যা হোক আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখ্‌ছি কেমন করে তিনি মেয়ে না পাঠান। আপনারা যেরূপ ভদ্রলোক—আপনাদের মাথায় করে রাখতে হয়,—

দোলগোবিন্দ বলিয়া উঠিল "মশাই! ওকথা বলবেন না।"

পুরুতের গলা,—ভট্‌চাজ বামুন রেগেছে—মহাগোল উঠিল। কামিনী ভামিনী প্রভৃতি যে সকল রসিকা এসে ফিরে গিয়েছিল তারাও গোল শুনে একে একে এসে উঁকি ঝুঁকি মার্ত্তে লাগ্‌লো। শুন্‌লে বে হয়ে গেছে—কর্ত্তা মেয়ে পাঠাবেন না বলে পুরুৎ ঠাকুর বকাবকি কচ্চেন। তারা ঠান্‌দিদিকে ডাকিল, বাসর জাগানির দাবি করিল। গোল-গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ঝনাৎ করিয়া দশ টাকা দিল। সকলেই খুবখুসি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েক জন ষণ্ডামার্ক বারোইয়ারির পাণ্ডা উপস্থিত। দোলগোবিন্দ খুব খাতির করে বসাইয়া কি চান জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা দশ টাকা চাহিল, দোল-গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ দশটাকা বাহির করিয়া দিল। পাণ্ডা বাবুরা ভারি খুসি—বলিল এমন ভদ্রলোক আর হয় না।'

পুরুৎঠাকুর বল্লেন "এমন ভদ্রলোক হয় না সত্যি, কিন্তু তোমাদের কসাই ঠাকুরের ব্যাভারটা একবার ভাব দেখি! দেড় হাজার টাকা মেয়ের দর হয়—বাবুরা দেড় হাজার টাকা—সে বল্‌তে গেলে আমার সামনেই বটে—গুণে দিলেন, বে হলো। তবে দেবতার দুর্য্যোগে এঁদের আস্তে একটু দেরি হয়। কর্ত্তা তাই বলে আরো দুই শত টাকা চান। টাকাও এঁদের কাছে আছে, সে কেবল আমাদের পাঁচজনকে দিবার জন্য; আর তাইবা ওঁরা দেবেন কেন? কর্ত্তা পণ করেছেন আর দুশো না দিলে মেয়ে পাঠাবেন না। আপনারা ভদ্রলোক, ভাল সময়েই এসেছেন, এর কি কোন উপায় হবে না?

একে বারোইয়ারির পাণ্ডারা সম্ভাবত ষণ্ডামার্ক গোঁয়ার—মূর্খ ও দাঙ্গাবাজ। গাঁয়ের সকলেই তাদের ভয় করে, তাহাতে কালরাত্রিতে কর্ত্তা তাহাদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কন নাই, তারা রেগে তালঠুকে বল্লে "কি! এদের সঙ্গে অভদ্রতা! কর্ত্তার কি মাথার উপর দুট মাথা—তিনি কি ধিঙ্গিপদ হয়েছেন? দেখি তাঁর কোন্ বাপ রাখে, আমরা মেয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি।"

পুরুৎ সহায়, মেয়েরা সহায়—শেষকালে গাঁ বিখ্যাত বারোইয়ারির পাণ্ডারা সহায়—আর "বউ" যায় কোথা।"

পাণ্ডারা দলবেঁধে বগল বাজিয়ে তালঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বাড়ীর ভিতর গিয়ে মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এলো। মহা গোল উঠিল। কর্ত্তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি কাচা খুলে পড়ছে, বুক্ চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে "আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! বলে পুলিশের দিকে ছুটিলেন। "ওগো মেয়ের বে হয় নি—আমি এক পয়সাও পাই নি—আহা আমার দেড় হাজার—দেড় হাজার টাকা—বাবাগো আমার সর্ব্বনাশ হল!

তোমাদের পায়ে পড়ি—মেয়ে ছেড়ে দাও," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কে তাঁর সে কথায় কাণ দেয়, মেয়েকে টেনে এনে পাল্কিতে তুলিল। কর্ত্তা অন্য উপায় না দেখে পুলিশে ছুটিলেন। আতাউল্লা হেড্‌কনেষ্টবল এসে উপস্থিত—তারও একটা দাও! এসে দেখ্‌লে যে বাড়ী—চারিদিকে ভদ্রলোক উপস্থিত। কারে কি বলিবে। দোলগোবিন্দ বলিল,—"জমাদার মশাই এসেছেন, বেশ হয়েছে, আসুন আসুন। এ শুভ কার্য্যে আপনারাও কিছু পেয়ে থাকেন। আমরা চোর নই—ডাকাত নই—বে দিতে এসেছি—তা যা হৌক এই ধরুন" বলে, পাঁচটি টাকা জমাদারের হাতে দিল। টাকা পেয়ে জমাদার সাহেব ভারি খুসি—একেবারে গলে গেলেন, বল্লেন "বাস্তবিকই তাই, আপনারা অতি ভদ্রলোক, কর্ত্তা পাগল হয়েছেন। আপনারা ওঁর কথা শুনিবেন না; বউ নিয়ে যান। আমি দাঁড়িয়ে থেকে পাঠাচ্চি।" কর্ত্তা অবাক।

বউ পাল্কিতে উঠিল—পাশে ভজ বসিল। জমাদার কহিল পাল্কি উঠাও। বেহারারা "হিম্‌প্রো" "হিম্‌প্রো" কোর্ত্তে কোর্ত্তে ছুটিল। দোলগোবিন্দ বলিল, 'বাজন্দারগণ! খুব জোরে বাজানা বাজাও। অমনি ঢোল, কাঁশি, শানাই—জোরে বাজিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর হতে এয়োরা,—বাহিরে দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি রুদ্রতালে "হুলধ্বনি" করিতে লাগিল। ভজর বিয়ে হল মহা সাড়া পড়ে গেল। দোলগোবিন্দ কেনারাম চক্রবর্ত্তী নামে কন্যাকর্ত্তার একজন জ্ঞাতিকে সঙ্গে করিয়া লইল। কর্ত্তা বুক চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন।

সেই রাত্রি ভজর বাড়ী মহা ধুম। ভজর মার মহা আনন্দ। পাড়া পড়শীর মেয়েরা ভজর বাড়ীতে মহা ব্যস্ত। ভজর বাড়ীতে বিবাহের সকল উদ্যোগই হইয়াছে। কেনারাম কন্যা সম্প্রদান করিলেন, ভজহরির বিবাহ হইল। ভজ আপন বাসরে বাসর সজ্জা করিয়া বসিল। আপন মনে গুণগুণ করিয়া গান গাহিল, কিন্তু এমন শুনা গিয়াছে, যে পর দিনের কুশণ্ডিকা পর্য্যন্ত ভজহরি গাঁজা খায় নাই। শুনা গিয়াছে যে, বৌভাতের সময় গাঁজার ধূমের অন্ধকারে নববধূ পরিবেশন করিবার সময় পাতভাত কিছুই দেখিতে পায় নাই। ইতি ভজহরির বিয়ে। এই বিবাহের কথা শুনিলে ও পড়িলে মহা-বংশজেরও অচিরাৎ বিবাহ হয়।

নয়ন চাঁদের ব্যবসা

—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

নয়নচাঁদের বাড়ী ফরাশডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয় থাকেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা নয়ন, লম্বোদর, গগন, প্রভৃতি বন্ধুগণ, আড্ডায় বসিয়া নিত্যক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই, তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,–"নয়ান! আজকাল তোমার কিছু সুখ সওয়াল দেখিতেছি চিনির জলে আর সে তোমার শোলা নাই। এখন সন্দেশ টুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে তোমার চা'ট হয় না। মুখে একটু কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ না কি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,–"সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বল দেখি নয়ান! গুলিখোর বলিয়া তোমাকে চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান, কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বল।"

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে বাজখাঁইস্বরে বলিলেন,–"আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,–"ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা। মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটা টানিও না, তোমার হেড্ খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—চট কেন ভাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয়তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। আর তার থেকে না বলা ভাল। আজ কাল আমার হইল ধর্ম্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয় তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দুপয়সা হইল, তা আমিতোমাদের বলিব না, আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতুহল হইল। কিসে নয়নের পয়সা হইল, এ কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়ই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,–"আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাস কি ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে জানিব যে তোমরা বন্ধু নও তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, খৃষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,–আর কি নাম করিতে বাকী রহিল, আড্ডাধারী মহাশয় ?"

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,–"আর কি বাকী আছে ? বাকী আর কিছুই নাই। সেই যে ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়াছিলেন,–'ওরে অঁটিকুড়োর বেটারা! যদি সতর পর্য্যন্ত তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি ?" ছেলেরা কেবল সতর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল; তা নয়ান! তুমি সতর ছাড়িয়া উনিশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছ। বাকি কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, খৃষ্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।"

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,–"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহাই ছুড়িয়া সেই ব্রাহ্মণ দেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মত চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্ মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। 'একবার আঠারো বলিলে হয়!' মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ! বড়ই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ওদিক ব্রাহ্মণের এরূপ উগ্রশর্ম্মামূর্ত্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,–'ভাই! এ পুকুর পাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে ? এই কথা বলিলেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল–এক, দুই ৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতর বলিল, আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন–'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা। আর বাকি রইলো কি ? যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি ?' এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যেদিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে খৃষ্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, আর ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত বলিলে। বাকি আর কি রহিল ? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।'

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,–না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, খৃষ্টান, কি তোমাদের আমি বলিতে পারি ? আমি বলিয়াছি যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।"

নয়ন বলিলেন,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও আমিও তাই। মুসলমান হও আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে, মনের মিল কোথায় রহিল?

সকলেই বলিলেন,—'ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভাল। আমাদেরও ঐ মত।"

নয়ন বলিলেন,—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজ কাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে তাতে সেকালের মত এখন আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশকোটি দেবতার পায়ে তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন,—'ঠিক! ঠিক্ ঠিক্ কথা! হাবড় তাবড় তেত্রিশকোটির চাল কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতর আঠারোর মানে কি?"

থাক, থাক! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সেটি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না মঞ্জুর করিয়া দাও।

নয়ন বলিলেন,—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফণী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।"

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—"হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে পড়ি। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।'

নয়ন পুনরায় বলিলেন,—'কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটী বাকি রাখিয়াছি। সে দেবতাটী, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ আমার সম্পত্তি, আর আমার ঐশ্বর্য্য। সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা!"

সকলেই বলিলেন,—"সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা!"

নয়ন বলিলেন,—"এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়' তোমার মাণিক পীর নয়। এ মা শীতলা! ইংরেজি খবরের কাগজে পর্য্যন্ত যার নাম বাহির হইয়াছে। মা'র বরে আমার সব।"

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল--আর একটু আগে তেত্রিশ কোটি দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটি শুনিয়া থাকেন, এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া হইল, ভাই? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে শোলা ফেলিয়া, সেই শোলাটি চুষিয়া চাট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল, ভাই?"

নয়ন বলিলেন,-'হঁ! এখন পথে এস! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ন এই চুপ!"

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

নয়ন বলিতেছেন-এবার আমার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয়, কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটা পড়িল। পরে যিনি যা করুন, কিন্তু ফিকিরটা আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছু মাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানাটানা লম্বালম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্ত-রোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙ্গিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়ীওয়ালা ও আশেপাশের লোককে বলিলাম যে, মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল, সে ভাল করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে, আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্ব্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্ত্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারি, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,-"মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনও ভয় নাই।"

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দুপয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশ-কর্ম্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি, শুন–

''শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়া অ্যাণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥
পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ।
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল॥
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধোরে খাই॥
শীতলা বলেন আমি চা'ল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই॥
চা'ল পয়সা আনো হবে পুজোর বাজার।
বসন্ত ধরিবে নাতো চৌষট্টি হাজার॥''

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে,–'নয়ান! হাইকোর্টের জজ-গিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি কর।'' আমি তাতেও রাজি হইতাম না।

প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নীকে বলিলাম,-''গিন্নী! এক বার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপ-ধোন! ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখখানটা দাও। গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে বাপ-ধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?''

কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদাচোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিও না সে কথা বলা বাহুল্য। সাদাচোখোদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না, প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ ছিঁচ্‌কে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা, তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক, কবে কার ছিঁচ্‌কে কোন গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন,—ছিটের জন্য কবে কোন গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচ্‌কে আনিয়াছে? ঘটিচোর বল, বাটি-চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু'কড়ার ছিঁচ্‌কে কে করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা চোখোগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্য কথা বলিতে শিখিবে না?''

লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিলেন,-''ঠিক বলিয়াছ। সাদাচোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা চোখোদের ছাঁওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।''

নয়ন বলিলেন,-''আর বিশ্বাস করিও না এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগাড় করিলে আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডায় হইতে বাহির হইলে, আর হয়তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর টলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয় তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড় হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটি দফা একেবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্ম্মান্তিক করে। পাল-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি। তা নয়! সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খাইয়া তর হইয়া থাকিবে! মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়ীতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। একি বাপু! এরে কি ভাল ভাল কাজ বলে? না এরে হিন্দু ধর্ম্ম বলে? থুঃ! ছি!''

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,-''এইরূপ কোনও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?''

নয়ন উত্তর করিলেন,-''হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলা ফেলা

গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারখানা কি, বল দেখি!

নয়ন বলিলেন,–"ভাই! এক দিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ী? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়ীতে গিয়া, মন্দিরেটি বাজাইয়া, সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,–"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই" আর মিনসে করিল কি যেন ভাই! এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতরে হইতে বাহিরে দৌড়াইয়া আসিল। তার সেই বিকট আঁ আঁ শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চম্‌কিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পালাইবার উদ্যোগ করিলাম। তাই ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মত আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তার পর দুঃখের কথা বলি কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক একটা কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জায়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,–হায় হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটি সে প্রাণটি আজ হারাইলাম।"

যাহা হউক, মনের সাধে কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পালাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা হইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে শীতলাকে বলিলাম যে,–"মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চা'ল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

গগন বলিলেন,–"ঈশ্! তাই তো। এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,–"সুবলের কি হইয়াছিল?"

গগন বলিলেন,–"দুধ বেচিয়া সুবলের পিসী কিছু টাকা করিয়াছিলেন! পিসী মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুর-গড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিন্নি, চোরা, ময়ুর, গণেশের শুঁড়, এই সব দেখিয়া সুবলের মনে বড় আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিকুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন এখন গোগ্‌গোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তার পর সেই গোগ্‌গালের জ্বালায় অস্থির! গোগ্‌গালের জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জনের সময় সুবল গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত যোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন –

ধন চাই না, মা! মান চাই না, মা। চাই পুত্তুর বর।

এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর। নয়ানেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চা'ল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি যোড়া

লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান, ঠিক নয়?"

নয়ন বলিলেন,–হাঁ, ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি! যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল, তার চিঠি! ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন,–'যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কি খাইয়া ফেলিবে?'

আমি বলিলাম,–'তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জান না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুণে-হলুদ বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বল, যাও-না ছাই! এঁটেল মাটি দিয়া আর একটি শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটি দিয়া গড়িতে পারিব না!"

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপ্‌রে বলিতে এখনও সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে! বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!

লম্বোদর বলিলেন,–"মাইরি?"

নয়ন বলিলেন,–"মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।"

সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটিতে পুতিয়া গেল! টাকরা পর্য্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পালাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভোম্বা হইয়া আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুইজনের মধ্যে যিনি কর্ত্তা-ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে, ভাবিব চিন্তিব? সুড় সুড় করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের একপাশে বসিলাম।

কর্ত্তা-ভূত বলিলেন,–আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিত্তির-জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটি জাগ্রত বটে। কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আট্‌কে থাকিতে হইয়াছে, তা না

হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটী ফিরিয়া লও, যে আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।"

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—"আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দুপয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।"

কর্ত্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?"

ভূতদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হঁা, শুনিতে চাই বই কি! তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে আর জ্ঞান থাকে না।"

কর্ত্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—"না না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মট্‌কাইব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।"

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না! কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড় সুড় করিতেছে; এস দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের নিশ-পিশ করিতেছে, এস ভাঙ্গিয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভাল-মানুষ ভূত। সেই কর্ত্তা-ভূতের এমন আশ্চর্য্য কাহিনী শুন।"

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন,—তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল কারণ এরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটী জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়, ভাল এঁটেল মাটি, ভাল সিন্দুর, ভাল রাঙ্গতা দিয়া গড়া। বেলে মাটি নয়। মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙ্গতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমার ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা হইতে পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌর-চন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌর-চন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা

দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইয়া আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্ত্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটী খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটী ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়! কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে রোগের বে-গতিক দেখিয়া, মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও পুণ্যকর্ম্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম্ম সকলই করিয়াছি। ভালকাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম। গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির-জা! আমার গোয়ালে এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কাকে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়াদাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুরটি শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটা নেড়া হইয়া ছিলাম। মাথাটা ঠিক্ বোম্বাই ওলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ী লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যাইবে? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌর-চন্দ্রিকা ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়-হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টীও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তপোষের উপর, কখনও তক্তপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পেছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা হইল চারিজন, আমি হইলাম একা। যতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কিনা? কাঁটা ফুটিয়া, ছিঁড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তিরজা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সে শরীর ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত। সকাল হইল।

প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরে সান-বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিনজন মাঠে ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,–"খুব মজার লোক তো তুমি! এত লোককে আমরা লইয়া যাই, কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পেছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় টিকি দেখিলাম না। অনেকের মাথায় আজকাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে,–এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাহাদের দুই গালে দুই থাবড়া মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,–"চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?"

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,–"তবে কিসের জন্য? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্য?"

আমি উত্তর করিলাম–"তাও নয়। এই যে তারের খপর আছে, সেই টুক্-টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।"

যমদূত বলিলেন–"ওঃ! বটে! সেই জন্য এখন বুঝিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,–"তোমাদের পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?

আমি বলিলাম,–"জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি মরিয়া ভূত হইয়াছেন।"

যমদূত বলিলেন,–"হাঁ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন এই পুষ্করিণীটি আমার।"

আমি বলিলাম,–"এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলির।

যমদূত বলিলেন,–"হাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার,—কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–"কি হইয়াছিল বলিবেন?"

যমদূত বলিলেন,–"বলিব না কেন, বলিব! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মত পেছলা-পিছলি কর! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।"

যমদূত বলিতেছেন,—নেই-আঁকুড়ে দাদার একটী বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ীর নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটী কলাগাছে দিব্য একখানি আগুট পাতা রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কাল এই আগুট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্ম্মে, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে আসিলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল। সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে, বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে,—"হায় রে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত? যমের কাণে সেই কথাটী প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাগি কি বলিতেছে?" আমরা বলিলাম, বিধবা বলিতেছে, যে যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমার এরূপ সাজা করিত? যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—"নিয়ে আয় তো রে, ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি, কি করিয়া সে আপনার বোন্‌কে বাঁচায়?' নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না।" আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম,—"চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কি সময় হইয়াছে? আমরা বলিলাম,—"না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ী যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি এখনি ফিরিয়া আসিবেন।" নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কথাটা কি শুন্‌তে পাই না? যমের বাড়ী গিয়া তাহার ভগিনী কি বলিয়াছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, চল যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,—দেখ, এই স্থলে আমি একটী দেবালয় করিব মানস করিয়াছি। আবার খানিক দূর গিয়া,—এই স্থলে আমি একটী অতিথি-শালা করিব, আমার এই ইচ্ছা। আবার খানিক দূর গিয়া,—সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টী আমি করিয়া দিয়াছি। এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে

লাগিলেন। যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,—নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আওট্ পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়েছি। কি করিয়া বোন্কে বাঁচাইবি বাঁচা! নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—আমার পুণ্যের অর্দ্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস্ দিন্। নেই-আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে, দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতাপত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—শুন্‌লিতো নেই-আঁকুড়ে! তোর একছটাকও পুণ্য নাই। বোন্কে তার আবার ভাগ দিবি কি? নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই সমুদয় দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা বলিলাম,—হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে, এখানে দেবালয় মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে, নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন। যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে? নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—আমার ভগিনী আওটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন না কেবল মানস করিয়াছিলেন? যম বলিলেন,—মানস করিয়াছিল। নেই-আঁকুড়ে বলিলেন, —তবে? যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইন করিয়া তিনি বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল, তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

কর্ত্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন,—যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমায় খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতাপত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত, চারিদিকে শত শত বিকটমূর্ত্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গস, কাহারও হাতে সাঁড়াসী। পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতাপত্র উল্টাইয়া চিত্র-গুপ্ত বলিলেন,—মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ! ইহার মত মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার

সময় এ যে চান্দ্রায়ণটা করে তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটা নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে, এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণকে একটা মর মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটী ব্রাহ্মণের ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটী এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুন্‌লে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও! তোমার যে রতি মাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফলভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?

আমি উত্তর করিলাম, মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তর, কিরূপ আইন কানুন, তা তো আমি জানি না? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তারপর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টা চাই।

যম উত্তর করিলেন,—"সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাতক করিয়াছ। সে জন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে, তোমার গলিতদেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূতে তোমার মাথায় ডাঙ্গস মারিবে। সাঁড়াসী দিয়া যমদূতে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিবিধমত তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চীৎকার করিবে। চির-কাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নাম মাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্ব্বে সেই যে মর-মর এঁড়ে বাছুরটী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবল মাত্র এক দিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।"

আমি বলিলাম,—"পুণ্যের ফলটী আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহা পরে আপনি করিবেন।"

যম আজ্ঞা করিলেন,—"ওরে! মিত্তিরজার সেই এঁড়ে গরুটা আন্‌তো!"

এঁড়ে গরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই! আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না। যমপুরীতে অনেক খোল ভুসি খাইয়া বাছুরটী এখন বিপর্য্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্যায় দুই সিং। দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ। রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ

ফোঁশ করিতেছে। রাগে পা-দিয়া মাটী চষিয়া ফেলিতেছে। কারে গুঁতাই, কারে মারি, সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দড়ি ধরিয়া চারজন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন,—"মিত্তির-জা! এই তোমার এঁড়ে গরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।"

এঁড়ে গরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সিং নীচে করিয়া, এঁড়ে গরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে এঁড়ে গরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম—"এঁড়ে গরু! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটী সিং তুমি এই যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটী সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।"

লম্বোদর, গগন, আচ্ছাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাহবা! বাহবা! মিত্তিরজা! তুমি একজন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তির-জা তোমাকে ঠিক্ কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে সিং দিতে বলিলেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন। শরীরের অন্যস্থানে সিং দিতে বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু কথাটী ভদ্র সমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধ হয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটী গোপন করিয়াছিলেন।"

নয়ান উত্তর করিলেন,—"আমারও মনে সে সন্দেহটী উপস্থিত হইয়াছিল! কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটী বলেন, তখন মিত্তির-জা ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তির-জা ভূত কি বলিতেছেন, তাহা শুন।"

মিত্তির-জা-ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গরু যম ও চিত্রগুপ্তকে তাহা করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তার পর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়।

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গরু না-ছোড়-বান্দা! যেখানে দৌড়িয়া পলান, সিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার সেই এঁড়ে গরু গিয়া উপস্থিত হয়।

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন,—যমপুরীর ভিতর কোনও স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্ত-ঘূর্ণিত-নয়নে এঁড়ে গরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। সেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদঘর্ম্ম মুমূর্ষুপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শনচক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহারা আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"এমানুষটী দেখিতেছি সাধারণ মানুষ্য নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকীর হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই মানুষটির কাছে যাই।"

যম বলিলেন,—"দ্বারে সেই এঁড়ে গরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস। আমি এঁড়ে গরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবে না।"

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গরু বলিল,—"মহাশয়! আপনার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন্। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,—"এঁড়ে গরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখ, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা, মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি

পুনরায় বলেন, না ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস! সকলে চল মিত্তির-জার কাছে যাই।"

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পালায়।

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি—মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ কারিয়াছিলাম।

যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পালাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতদিগকে হুকুম দিলাম,—"যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্ত্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাস কর।"

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ পাপী খালাস পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পূতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপিগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্ম্মকার আনাইয়া পাপীদিগের হস্তপদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্ম্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া যোড় হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল "ধন্য মিত্তির-জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম, না হইলে, নির্দ্দয় যম যে আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।"

সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে পাপিগণ এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিত্তির-জা! এ কি বল দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম, 'আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটী দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই মা! সে যা হউক, এখন

আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তার আর আবার পাপ কোথায়? তার পর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"না মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্ব্বে যোড়হস্তে নারায়ণের নিকট একটী প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁশ করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায় আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ন-চাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি সে কাজটী করিয়াছিলাম।"

নারায়ণ বলিলেন,—"ঈশ্! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটী আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়ন-চাঁদের শীতলাটী ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়ন-চাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।"

কি করিব? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটী লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠ গমন করি। এই বলিয়া মিত্তির-জা-ভূত আমার শীতলাটী আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নয়ান! সেই যে আর একটী ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভূতটী কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ, করিয়াছিলাম! শুনিলাম যে, সেটী নেই-আঁকুড়ে দাদার

ভূত। মর্ত্ত্যে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

নয়ন বলিলেন,—"শীতলাটী হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটী সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হইল। তাহার পর হাউই-বাজীর মত একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর তুমি কি করিলে?"

নয়ন বলিলেন,—আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কালেজের সেই এম,এ, পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকা কড়ি ঘরে ধরে না। কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটী কমিয়া গেল। সাহেবেরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটী শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।"

সকলে মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—"হে মা কাটি-গঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ।"

চীনের কলসী

—রাজকৃষ্ণ রায়

বহুকালের কথা বোল্‌চি—যখন এই বাঙ্গালা দেশে পালরাজারা রাজত্ব কোত্তেন—সেই সময় এ দেশের এক শ্রী ছিলো। সে শ্রী আর এখন নেই। কখন যে হ'বে কি না, তা'ই বা কে বোল্‌তে পারে? সেই পালরাজাদের মধ্যে এক জন যে খুব বীর ছিলেন—তিনি যে অনেক দেশে বিদেশ লড়াইয়ে জিতেছিলেন, তা' বোধ হয়, যিনি বাঙ্গালার ইতিহাস পোড়েচেন, তিনিই জানেন।

সেই রাজা এক সময় আসামের ভিতর দিয়ে তিব্বত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর্‌তে যান। আস্‌বার সময় ঐ দেশ থেকে কতকগুলি কারিকরকে কয়েদ কোরে আনেন। সেই কারিকরেরা চীনের বাসন তোইরি কোত্তো। রাজার ইচ্ছে ছিলো যে, বাঙ্গালা দেশেও চীনের বাসন তোইরি হয়।

সেই কয়েদীদের মধ্যে একটি ১৩।১৪ বছরের মেয়ে ছিলো। ঐ মেয়েটি চীনের বাসনের উপর খুব সরেস্‌ কাজ কোত্তে পাত্তো। রাজা তা'র কাজ দেখে তা'কেও এনে-ছিলেন। কিন্তু ঐ মেয়েটি এ দেশে এসে আর তেমন সরেস কাজ কোত্তে পাত্তো না—সে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাক্‌তো—আর কি ভাব্‌তো। কেন যে ভাব্‌তো, তা' কেমন কোরে জান্‌বো? কিন্তু তা'রা যে কারণ বলে, রাজা কোন রকম কষ্ট দিতেন তা' নয়—বরং তা'দের সুখে থাক্‌বার সুবন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিলেন। যে কারখানা-ঘরে তা'রা কাজ কোত্তো, সেইখানে রাজা তা'দের এক জন ওপোরওয়ালা রেখেছিলেন। সে, কে কেমন কাজ করে তাই দেখ্‌তো। এক দিন সে সেই মেয়েটিকে বোল্‌লে,—"দেখ, বাছা! তোমার কারিকুরী এখন আর সাবেকের মত হয় না কেন? ঐ দেখ দিকি, যে ঘটিটি তুমি দেশে থেকে এনেচো, ওটি কেমন সুন্দোর চিত্তির করা! এখানে এসে পর্য্যন্ত ত তুমি একটি দিনও অমন কাজ কোল্‌লে না। রাজাকে কি জবাব দেবে বল দেখি?"

কিন্তু মেয়েটি তা'র কথার কোন উত্তরই দিলে না, কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো; সেও আর কোন কথা না বোলে চোলে গেলো। ঐ সময় এক দল যুবা সেই কারখানায় বেড়া'তে এলো। তা'দের মধ্যে এক জন রাজসংসারে থাক্‌তেন। রাজা তা'কে বড়ই ভাল-বাস্‌তেন। তাঁ'র নাম বিজয়চন্দ্র। তা'রা এসে দেখ্‌লে যে, ঐ মেয়েটি কাঁদ্‌চে।

বিজয় গিয়ে তাঁকে জিগ্‌গেস্ কোল্লেন, "হ্যাঁগা বাছা! তুমি কাঁদ্‌চো কেন? কেনই বা মন দিয়ে কাজ কোচ্চো না? তুমি যখন দেশে ছিলে, যখন ত বেস্ কাজ কোত্তে? —ঐ ঘটিটি ত তোমার চিত্তির করা?"

মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে,—"হ্যাঁ মশাই! আমিই ওটি চিত্তির কোরেছিলুম। —হায়! মহারাজ যদি ওটি না দেখ্‌তেন"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্‌তে পাল্লে না—খুব চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

বিজয় বোল্‌লেন,—"রাজা না দেখ্‌লে তুমি দেশে থাক্‌তে কিন্তু তা' ভেবে আর কোর্‌বে কি বল? এখন যা'তে এই দেশেই সুখে থাক্‌তে পার, তা'র চেষ্টা কর। রাজাও আর তোমায় জেলে কয়েদ কোরে রাখেন নি।"

মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌লে,—"মশাই! দেশের কথা ভুল্‌বো কেমন কোরে? —দেশে যে এই পোড়াকপালীর বুড়ো বাপ মা আছেন—তাঁ'রা যে না খেতে পেয়ে কত কষ্ট পা'বেন, সেই সব কথা মনে হোলে আর আমার কাজ কোত্তে ইচ্ছে করে না। আমি মনে মনে ঠিক্ কোরেচি, আর আমি কাজ কর্ম্ম কোর্‌বো না—তা' রাজা আমায় যদি মেরে ফেলেন, ভালই—আমার জ্বালা যন্ত্রণা সব একবারে ঘুচে যাবে।"

আর একটি কারিকর সেখানে ছিলো। সে মেয়েটিকে বোল্লে,—দিদি, কি কর্‌বি বল্?—রাজা, যা' ইচ্ছে তা'ই কোত্তে পারেন। তা' বোলে আপনার প্রাণ খোয়ানো কেন?"

এই কথা শুনে বিজয় বোল্লেন,—"রাজার যা' ইচ্ছে তিনি তা'ই কোর্‌বেন, তিনি কি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেল্‌বেন? তা' যদি করেন, তিনি ঘোর অত্যাচারী!"

এই কথা ক'টি শুনে বালিকাটির ভরসা হোলো, সে বিজয়ের পায় ধোরে বোল্‌লে,— "মশাই! আপনি আমায় বাঁচান।—অথবা আমার এখান থেকে উদ্ধার করুন। আপনি মনে কোল্‌লে পারেন।"

বিজয় বোল্‌লেন,—"দেখ্‌বো! প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, তবু তোমায় উদ্ধার কোরে, তোমার বাপ মার কাছে পাঠাবো।"

ঐ সময় আর একটি যুবক বোল্‌লে,—"ভাই! এমন ভাল কাজে চেষ্টা কোর্‌বে, খুব ভাল। কিন্তু, ভাই! অমন উগ্রবৃত্তিতে এ কাজে হাত দিলে কি ফল হ'বে বলো? রাজার কাছে যদি এমন অবস্থায় কোন কথা বলো, তা'তে হিতে বিপরীত হ'বে।"

বিজয় পূর্ব্বমত জেদেই বোল্‌লেন,—"তুমি কি কোত্তে বলো, সুবোধ? এই বালিকাটি এম্‌নি কোরে কষ্ট সইবে—দেখে, কে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে?"

সুবোধ বোল্‌লেন,—"নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বলি নে। কৌশলে কার্য্যসাধনের চেষ্টা দেখো।"

বিজয় বোল্লেন,—"কৌশল!—কৌশল তোমার ন্যায় ব্যবহারাজীবীর সম্বল। আমার ন্যায় লোকের সাহসই বল।"

সুবোধ একটু হেসে বোল্লেন,—"যুদ্ধেও কি কৌশলের প্রয়োজন হয় না?"

বিজয় বোল্লেন,—"যাও, ভাই! তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পার্‌বো না।" কিন্তু এইবার তাঁ'র ভাব কিছু নরম বোধ হোলো।

সুবোধ হেসে বোল্লেন,—"ভাই! তর্কই আমার ব্যবসা—তর্কই আমার বল।"

বিজয়, "কিন্তু আমার অন্য বল আছে" বোলে, কটিস্থ অসিতে হাত দিলেন।

সুবোধ।—কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ওতে কোন্ কাজ হ'বে? বরং আমার কথা শোনো—আমার তর্ক-বল আগ্রহ কোরে একবার দেখো, তা'তে যদি কোন ফল হয়। আমার দ্বারা তোমার যখন যে কোন কাজ হোতে পার্‌বে, আমি তা'তে অনায়াসে প্রস্তুত আছি।

তা'র পর দু'জনে মিলে বাড়ীতে গিয়ে মন্ত্রণা কোরে মেয়েটির হোয়ে রাজার কাছে এক দরখাস্ত কোল্লে।

(২)

সেই দিন বিকেল বেলা বিজয় সেই দরখাস্তখানি হাতে কোরে রাজার কাছে গেলেন। রাজা দরখাস্তখানি হাতে কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌লেন,—"বিজয়! আমি তোমায় পুত্রাপেক্ষা ভালবাসি। তুমি কি আমাকে অত্যাচারী স্থির কোচ্চো?"

বিজয় কুণ্ঠিত হোয়ে বোল্‌লেন,—"মহারাজ! আপনাকে অমন কথা কে বোল্‌লে?"

রাজা বোল্‌লেন,—"বল্‌বার লোকের অপ্রতুল কি? তুমিও আর লুকিয়ে বল নি।"

বিজয় বোল্‌লেন,—"মহারাজ! অমন কথা আপনাকে যে শুনিয়েচে, সে মিথ্যে শুনিয়েচে। আমি তা' বলি নি। আমি একটি মেয়ের কষ্ট দেখে বোলেছিলেম—তিনি যদি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেলেন্ তো তিনি ঘোর অত্যাচারী। মহারাজ! এই সেই মেয়েটির পক্ষে দরখাস্ত।"

রাজা সেই দরখাস্তখানি পাঠ কোরে বোল্লেন্,—"বিজয়! এই দরখাস্তখানি কে লিখেচে?"

বিজয়।—আমার বন্ধু সুবোধ।

রাজা।—সুবোধ? সে তো বিচারশাস্ত্রে বেস্ দক্ষ হোয়েচে। যা'ই হোক্, এ দরখাস্তের যা' উত্তর দেবো, তা' তোমায় বলি শোনো। কা'ল এই আদেশ বেরোবে যে, এক মাসের মধ্যে একটি সুন্দর চীনের কলসী প্রস্তুত কোত্তে পার্‌বে, তা'কে হয় দেশে যেতে দেওয়া যা'বে, নয় ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। এ দু'য়ের যা' ইচ্ছা, সে নিতে পার্‌বে; আর ঐ কলসীতে তা'র নাম খোদা থাক্‌বে।"

বিজয় তাই শুনে তখনি সেই কারখানায় গিয়ে মেয়েটিকে এই খবর দিলেন।

মেয়েটি শুনে তখনি কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোল্লে।

তা'র পরদিন রাজার হুকুম বেরুলো। হুকুম পেয়ে সকলেই কলসী প্রস্তুত কোত্তে

আরম্ভ কোল্লে। কিন্তু, বোল্‌তে কি, মেয়েটির মত একাগ্র হোয়ে কেউ কাজে এগুতে পাল্লে না। কেন না, আর সকলের লোভ টাকার উপর, কিন্তু মেয়েটির মা বাপকে দেখ্‌বার ইচ্ছা।

ক্রমে সকলের কলসী প্রস্তুত হোলো। বিজয় সেই মেয়েটির কলসীর নীচে লিখে দিলেন,—

"ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ!
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে॥"

(৩)

ক্রমে মাসের শেষ দিন হোয়ে এলো—শেষ দিনে রাজা কলসীগুলি দেখ্‌বেন।

কলসীগুলি এক্‌টি ঘরে সাজানো হোয়েচে। কারখানাকর্ত্তা উপস্থিত আছেন। কারিকরেরা কা'র কপাল প্রসন্ন হয় দেখ্‌বার জন্যে সবাই হাজির।

এমন সময় মহারাজ মন্ত্রীদের সঙ্গে সেখানে এলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে বিজয়ও সুবোধ ছিলেন।

তা'রা সকলে ঘরের ভিতর গেলেন।

রাজা একে একে কলসীগুলো অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তা'র পর বোল্লেন,—

"বিজয়! দেখ তো ও কলসীটা কা'র?"

বিজয় গিয়ে একটি সুন্দর কলসী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"এইটে?"

রাজা।—হাঁ।

বিজয়।—এইটি সেই মেয়েটির।

রাজা।—দাও দিকি দেখি।

রাজা কলসীটি নিলেন—অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌লেন। তা'র পর একে একে সকলে কলসী দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

সকলের দেখা হোলে রাজা সেই কারখানার কর্ত্তাকে বোল্লেন,—"তুমি এই কলসীটে ঝেড়ে রাজসভায় নিয়ে এসো। আমরা চোল্লেম। এটা চীনদেশের রাজার কাছে পাঠা'তে হ'বে। চীনরাজ দেখুন, আমার দেশেও চীনের বাসন হয়।" এই কথা বোলে রাজা চোলে গেলেন।

কারখানার কর্ত্তা একজন লোককে সেটা মাজ্‌তে বোল্‌লেন।

সে জল দিয়ে ধু'তে ধু'তে এক বার সেই কলসীটে এনে কর্ত্তাকে দেখা'লে ; বল্লে,—"কর্ত্তা মশাই। এই জায়গার রং উঠে যাচ্চে।"

কর্ত্তা।—কৈ দেখি ?

সে লোকটা কলসীটা এনে দিলে। কর্ত্তাটি আপনার চাদর দিয়ে একটা জায়গা খানিকক্ষণ মুছে বোল্লেন,—"হোয়েচে, আর যায় কোথা ? এইবার ব্যাটার মাথা খেয়েচি।"

এই কথা বোলে কলসীটা নিয়ে চোলে গেলো।

(৪)

এ দিকে বিজয় ও সুবোধ রাজার কাছ থেকে ছাড়চিটি নিয়ে সেই মেয়েটিকে খোলোসা কোরে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। মেয়েটির যে আহ্লাদ হোয়েছিলো তা' আর কি বোল্‌বো। সে গিয়ে সুবোধের মা'র কাছে বিজয় সুবোধের কত প্রশংসাই কোত্তে লাগল।

হঠাৎ এমন সময় রাজবাড়ী থেকে লোক এসে বিজয়কে বোল্‌লে,—"রাজার হুকুম,—আপনি আর এই মেয়েটি কয়েদ হোলেন।"

শুনে বিজয় রেগে বোল্লে,—"কেন—কি জন্যে ? কারণ না শুনিয়ে আমায় কয়েদ করে কে ?"

লোকটি বোল্‌লে,—"কারণটি যে কি, তা' আমি কেমন কোরে জান্‌বো। রাজা হুকুম কোরেচেন, আমি এয়েচি ; ক্ষমতা হয়, আপনাদের কয়েদ কোরে নিয়ে যাবো, না পারি, ফিরে গিয়ে বোল্‌বো, পাল্লেম্ না।"

এই সময় একটি দু'টি কোরে প্রায় সাত আটটি পাইক্ এসে উপস্থিত হোলো।

এ কালে শমনের পেয়াদা মানুষের বাড়ীতে ঢুক্‌তে পারে না, সে কালে রাজার হুকুম হোলে, দরজা ভেঙে ঘুমন্ত মানুষকে বেঁধে নিয়ে যেতো, তা'তে দাদ ফৈরেদ ছিলো না।

সুবোধ বোল্‌লে,—"ভাই বিজয়! এ ক্ষেত্রেও অন্য বল দেখা'বার দরকার নেই। আমার তর্ক-বলে তোমাদের উদ্ধার কোর্‌বো।"

বিজয় বন্ধুর কথাগুলি যথার্থ ভেবে, কাজে-কাজেই কয়েদ হোলেন। মেয়েটিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোল্‌লো। রাজার হুকুম ছিলো না, তাই তা'রা বেঁধে নিয়ে গেলো না।

এ দিকে সুবোধ আর দেরি না কোরে রাজদরবারে গেলেন এবং বিজয় কেন কয়েদ হোয়েচেন, তা'র কারণ জান্‌বার জন্যে দরখাস্ত কোল্‌লেন।

দরখাস্তে উত্তর এলো,—"বিজয় ঐ বালিকাটির কথামত সেই কলসীর গায়—

"ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ!

এ পৃথিবীমাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে।।"

এই কবিতাটি লিখেছিলেন, তাই তাঁদের কয়েদ করা হোয়েচে।"

সুবোধ পোড়ে কি ভাব্‌লেন। তা'র পর তাড়াতাড়ি সেই কারখানায় গিয়ে একে তা'কে কত কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন্। তা'র পর আবার রাজসভায় এসে বোল্লেন্,—"মহারাজ! আমি আমার বন্ধুর পক্ষে বিচার প্রার্থনা করি।"

রাজা বোল্লেন,—"যখন দেখা যাচ্চে যে, বিজয় আমাকে অপদস্থ কর্‌বার জন্যে এই কাজ কোরেচে, তখন তা'র আর বিচার কি? তবে যদি এই ভাবে দরখাস্ত কর যে, যদি তা'কে নির্দ্দোষ প্রমাণ না কোত্তে পার, তা' হোলে তুমিও কয়েদ হ'বে, তা' হোলে আমি বিচারপতিদের অনর্থক কষ্ট দিতে পারি।"

সুবোধ তা'ই কোল্লেন।

স্থির হোলো পরদিন বিচার হ'বে।

(৫)

পরদিন বিচারস্থল লোকে লোকারণ্য। রাজা বিচারকদের নিয়ে বোসে রোয়েচেন। এক ধারে বিজয় হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন সময় রাজা প্রধান মন্ত্রীকে সুবোধের দরখাস্তখানি দিয়ে বোল্লেন,—"মন্ত্রী! তুমি এখানি সকলের সুমুখে পাঠ কর।"

মন্ত্রী পোড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেন্—

"মহারাজ! আমি আমার বন্ধুকে নির্দ্দোষী জেনে আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা কোচ্চি। যদি তাঁ'কে নির্দ্দোষী বোলে প্রমাণ কোত্তে না পারি, তা' হোলে বিচারকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অপরাধে বন্ধুর সহিত কারাবাস কোর্‌বো।"

তা'র পর মন্ত্রী বোল্লেন,—"রাজার আদেশে আজ বিচার হ'বে। বিজয়ের অপরাধ এই যে, মহারাজকে অত্যাচারী বোলেচে। বোধ হয়, সকলেই জান, মহারাজ চীনের সীমান্তবাসী কতকগুলি লোককে কয়েদ কোরে আনেন। সম্প্রতি মহারাজ হুকুম দিয়েছিলেন যে, তা'দের মধ্যে যে কেউ একটি সুন্দর কলসী প্রস্তুত কোরে রাজাকে তুষ্ট কোত্তে পার্‌বে, রাজা তা'কে খোলোসা কোরে দেবেন, আর যদি সে এ দেশে থাক্‌তে চায়, তা'কে ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক দেবেন। ঐ বালিকাটি একটি কলসী প্রস্তুত করে। রাজার সেইটি মনোনীত হয়। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট দেখ;—সে এই বিজয়কে দিয়ে তা'র উপর এই কয় ছত্র লিখিয়েচে—

(কলসীটি তুলিয়া পাঠ)

"ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোষে তব নাম ওহে মহারাজ।
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে।।"

এই কয়টি কথা পাঠ হ'বা মাত্র বিজয় বোললেন,—"মিথ্যা কথা, প্রথমের কয়টি কথা আমি কখনই লিখি নাই।"

মন্ত্রী।—লিখেচ কি না, তা'রি বিচার হ'বে। কিন্তু এই সময়টিরই হস্তাক্ষর একরূপ, বিশেষতঃ যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা'তে বিজয় যে সম্পূর্ণ দোষী, তা'র তো আর কোন সন্দেহই হয় না; এখন ঈশ্বর করুন, যেন সে নির্দ্দোষীই হয়।

এই কথা বোলে মন্ত্রী বোস্‌লেন। তা'র পর এক জন উঠে বোল্‌লেন,—"আপনারা সকলে দেখুন, বিজয় দোষী কি না।"

এই কথা বোলে তিনি কারখানার কর্ত্তাকে ডাকা'লেন।

কারখানার কর্ত্তা উপস্থিত হইল।

"আপনি এই কলসীটি আর কখন দেখেছিলেন?"

উত্তর।—অবশ্য দেখিচি। ওটি ঐ মেয়েটি আমার স্মুখে কারখানায় বোসে তোইরি কোরেছিলো।

প্রশ্ন।—এতে যখন লেখা হয়, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?

উত্তর।—হাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন।—কে লেখে?

উত্তর।—ঐ বিজয়।

প্রশ্ন।—কি লেখেন, তা' তুমি জান?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—মহারাজকে এই কবিতাটি দেখায় কে?

উত্তর।—আমি।

প্রশ্ন।—কবে তুমি কবিতাটি পোড়েছিলে?

উত্তর।—যে দিন মহারাজ এই কলসীটি দেখেছিলেন।

প্রশ্ন।—মহারাজ তো উপরের ছত্র দেখ্‌তে পান নাই?

উত্তর।—তখন ওটি নীল রঙে ঢাকা ছিলো।

প্রশ্ন।—তুমি দেখ্‌তে পেলে কি কোরে?

উত্তর।—মহারাজ আমাকে এটি মেজে ধুয়ে রাজসভায় আন্‌তে বোল্লেন। আমি আমার ঐ চাকরকে এটি মাজ্‌তে বলি। সে মাজ্‌তে মাজ্‌তে বোল্লে,—"মশাই! এই জায়গার রংটা উঠে যাচ্ছে। আমি গিয়ে এই চাদর দিয়ে মুচ্‌তে মুচ্‌তে ঐ কথা ক'টি দেখ্‌তে পেলেম্। তাই রাজাকে দেখালেম্।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"চীনের বাসনের রং কখন উঠে যায়?"

উত্তর।—পোড়া'বার পর যে রং দেওয়া যায় তা' উঠে যায়।

প্রশ্ন।—তুমি জান, পোড়া'বার পর কে এই রং দিয়েছিলো?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—ভাল, পোড়া'বার পর তুমি এই কলসী দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ। আমি ওটি অন্য অন্য কলসীর সঙ্গে যে ঘরে সাজানো ছিলো, সেই ঘরে পাঠাই।

প্রশ্ন।—তখন তুমি দেখেছিলে ওতে কি লেখা আছে?

উত্তর।—অত লক্ষ্য করি নি।

সুবোধ বোল্লেন—"ভাল, আর তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য নেই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী, কর্ত্তার চাকর।

রাজপক্ষীয় ব্যবহারজীব জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"তুমি এ কলসীটি এর পূর্ব্বে দেখেছিলে?"

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কবে?

উত্তর।—কা'ল।

প্রশ্ন।—কোথায়?

উত্তর।—যে ঘরে এটি অনেকগুলি কলসীর সঙ্গে সাজানো ছিলো।

প্রশ্ন।—এতে কি লেখা ছিলো জান?

উত্তর।—আমি পড়্‌তে জানি নি।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"তুমি কলসীটি কত দূর হোতে দেখেছিলে?"

উত্তর।—নিজে হাতে কোরে দেখেছি।

প্রশ্ন।—তোমার হাতে এ কলসী গেলো কেমন কোরে?

উত্তর।—কর্ত্তা আমাকে মাজ্‌তে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন।—মাজ্‌তে মাজ্‌তে তুমি কি দেখেছিলে?

উত্তর।—দেখ্‌লেম্‌—নীল রং উঠে যাচ্চে।

প্রশ্ন।—দেখে তুমি কি কোর্‌লে?

উত্তর।—কর্ত্তাকে দিলেম।

প্রশ্ন।—কর্ত্তা দেখে কি বোল্‌লেন?

উত্তর নাই।

প্রশ্ন।—বোল্‌চো না কেন? তোমাকে সাজা পেতে হ'বে।

উত্তর।—(স্বগত) হোয়েচে আর কি!—এইবার ব্যাটার মাথা খেয়েচি।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো।

তা'র পর সুবোধ আর দু'টি লোককে ডাকা'লেন। তা'র একটিকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন,—

"তুমি কারখানায় কাজ কর?"

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়াবার ঘরে নিয়ে যাই।

প্রশ্ন।—তুমি এই কলসীটি কখনো পোড়াবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে তোমার স্মরণ হোলো যে, এটি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—আমি ঝুড়িতে কোরে এটির সঙ্গে আরো অনেকগুলি কলসী নিয়ে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর নিয়ে গেলে এটা পড়ো-পড়ো হোয়েছিলো। আমি এটাকে ভাল কোরে বসা'বার সময় এই ছবিটে দেখ্‌লেম্‌, দেখে বড় সুন্দর বোধ হোলো; তাই অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌লেম্‌, তাই তো চিন্‌তে পার্‌চি।

প্রশ্ন।—ছবির নীচে কি রং ছিলো মনে হয়?

উত্তর।—নীল রং ছিলো।

প্রশ্ন।—এ লেখাগুলো দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—এ কি লেখা জান?

উত্তর।—আমি পোড়তে জানি নি।

প্রশ্ন।—ক'গার লেখা ছিলো ?

উত্তর।—তা' আমি গুণি নি।

সুবোধ।—ভাল, তুমি বোসো।

তা'র পর তিনি অপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"তুমি কারখানায় কি কাজ কর ?"

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়াই।

প্রশ্ন।—তুমি এ কলসী পুড়িয়েছিলে ?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে চিন্‌লে ?

উত্তর।—ঐ লোকটি (বাহককে দেখাইয়া) আমায় ছবিটি দেখায়, তাইতে চিন্‌চি।

প্রশ্ন।—ভাল, ও লোকটি এ কলসীটি কোথায় রেখেছিলো ?

উত্তর।—একটা ঝুড়ির উপর।

প্রশ্ন।—তা'র পর তুমি কখন্ পোড়া'তে দিয়েছিলে ?

উত্তর।—তা'র অনেক পরে।

প্রশ্ন।—তখন তুমি কি কোচ্ছিলে ?

উত্তর।—কখন্ ?

প্রশ্ন।—যখন ঐ লোকটি এগুলি তোমার কাছে নিয়ে যায় ?

উত্তর।—তখন বোসেছিলেম।

প্রশ্ন।—ও লোকটি রেখে কি কোল্লে ?

উত্তর।—চোলে গেলো।

প্রশ্ন।—তা'র পর তুমি কি কোল্লে ?

উত্তর।—আমি পোড়া'বার জন্যে আগুন কোত্তে লাগ্‌লেম।

প্রশ্ন।—তুমি যখন আগুন কোচ্ছিলে, তখন আর কেউ সে ঘরে গিয়েছিলো ?

উত্তর।—মনে হয় না।

প্রশ্ন।—মনে কোরে বলো ?

উত্তর।—(ভাবিয়া) কর্ত্তা গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন।—কিসে স্মরণ হোলো?

উত্তর।—তিনি আমায় জিগ্‌গেস্ কোরেছিলেন, এখনো আগুন হয় নি?

প্রশ্ন।—তুমি তা'তে কি বোলেছিলে?

উত্তর।—আমি একমনে আগুন কোত্তে লাগ্‌লেম্, কিছু বলি নি।

প্রশ্ন।—কর্ত্তা কখন্ চোলে গেলেন?

উত্তর।—তা' টের পাই নি।

প্রশ্ন।—আর এসেছিলেন?

উত্তর।—টের পাই নি।

প্রশ্ন।—ভাল, তুমি কলসীটি কখন্ আগুনে দেও, স্মরণ হয়?

উত্তর।—হয়।

প্রশ্ন।—কিসে?

উত্তর।—আমি সব কলসীগুলি লেপে মুচে আগুনে দেবার জন্যে, ঝুড়িটে আমার পেছোন থেকে ডান দিকে এনেছিলেম, এক এক কোরে সবগুলি আগুনে দিয়ে দেখ্‌লেম্, এটা আমার পেছোনে মেজেতে বসানো আছে। তা'র পর সব শেষে এটা আগুনে দিই।

প্রশ্ন।—তুমি আর একটু আগে, বোল্‌লে, এটা ঝুড়ির উপর বসানো ছিলো, এখন বোল্‌চো, তুমি এটা তোমার পেছোনে মেজের উপর থেকে নিয়ে আগুনে দিয়েছিলে। মেজের উপর কে রেখেছিলো জানো?

উত্তর।—আমি বোধ করি—কর্ত্তা।

প্রশ্ন।—তোমার এরূপ অনুমান কর্‌বার কারণ কি?

উত্তর।—তিনি একবার বোলেছিলেন এই কলসীটে নিশ্চয়ই রাজার মনের মত হ'বে। আর কি বোলেছিলেন, আমি বুঝ্‌তে পারি নি। তাইতেই বোধ কোচ্চি, তিনি এটা হাতে কোরে দেখে থাক্‌বেন।

প্রশ্ন।—তুমি কলসীগুলি আগুনে থেকে তুলে কি কোরেছিলে?

উত্তর।—আমি সবগুলি কর্ত্তার কাছে দিয়ে এসেছিলেম।

প্রশ্ন।—কর্ত্তা তখন কি কোচ্ছিলেন?

উত্তর।—একটা বাটিতে নীল রং গুলছিলেন।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো।

রাজা।—আমার বেস্ বোধ হোচ্চে, খলস্বভাব তত্ত্বাবধায়ক এই কাণ্ড কোরেচে।

সুবোধ।—মহারাজ। তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমি কা'ল সন্ধ্যাকালে কারখানার দ্বারে এই কাগজটুকু পেয়েছিলেম; এতেই সব মীমাংসা হ'বে।

এই বোলে সুবোধ মহারাজের হাতে এক টুক্‌রো কাগজ দিলেন। মহারাজ দেখ্‌লেন যে, তা'তে প্রথম ছত্র ছাড়া শ্লোকটি লেখা রোয়েচে। তা'র উপরে অনেকগুলি ম, ঘ, র, অ, ত, চ, ও, া, ধ, ৌ লেখা রোয়েচে, আর শ্লোকের ঐ অক্ষরগুলিও মোটা হোয়েচে। তা'ছাড়া, ঘোর অত্যাচারী তুমি, ২০।২৫ বার লেখা আছে। তা'র অনেকগুলি লেখার সাদৃশ্য কর্ত্তার লেখার সঙ্গে মিল্‌লো; সুতরাং কর্ত্তার আর কথা ক'বার যোটি রোইলো না।

তিনি দোষী সাব্যস্ত হ'লেন। রাজার হুকুম তাঁ'কে চিরজীবনের মত শ্রীঘরে বাস কোত্তে হোলো। বিজয় খোলোসা পেলেন। বিশেষতঃ রাজা সুবোধের উপর বড় খুসী হোয়ে বিজয় আর সুবোধকে দু'টি উচ্চ কর্ম্ম দিলেন। বিজয় সহকারী সেনাপতি ও সুবোধ নগরের প্রধান বিচারকের পদ পেলেন।

বালিকাটি যে খোলোসা পেয়ে দেশে গেলো, তা' আর্ বল্‌বার অপেক্ষা কি?

(৬)

যথাসময়ে বালিকাটি চীনের মুলুকে গিয়ে আপনার বাপ মাকে দেক্তে পেলে। কিন্তু তা'র শোকে তা'র বাপ মা এত অধীর হোয়ে কাল-যাপন কোচ্ছিলো যে, তা'র আর তুলনা নেই। এখন তা'রা তা'দের একমাত্র আদরের মেয়েটিকে পেয়ে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে। বালিকাটি, কি কোরে বঙ্গদেশের রাজার কাছ থেকে মুক্তি লাভ কোরেছে, তা' তার পিতামাতা আর গ্রামশুদ্ধ সকল লোককে খুলে বোল্লে। তা'রা তা'র কথা শুনে অবাক্ হোয়ে গেলো। সে যে টাকার লোভে মা বাপের ও দেশের মায়া ছাড়্‌তে পারে নি, এই জন্যে সকলে তা'র কত প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লো। বিশেষতঃ সে যে কৌশল কোরে মুক্তি লাভ কোরেচে, এ কথা শুনে পাড়াপড়সীর আর আনন্দের সীমা রোইলো না।

ক্রমে সেই বালিকাটির কথা চীন রাজ্যের রাজার কর্ণগোচর হোলো। তিনি তাঁ'র রাজ্যের একটি অল্পবয়স্কা বালিকার এরূপ অদ্ভুত বুদ্ধি ও দেশভক্তির কথাশুনে বড় সুখী হোলেন। অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে তা'র পিতামাতার সঙ্গে রাজ-ধানীতে আনা'লেন। তা'র পর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরমার্শ কোরে, তা'র পিতা মাতার মত নিয়ে আপনার ছোট ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিলেন। বালিকাটি চীন-সম্রাটের পুত্রবধূ হোয়ে পিতামাতার সঙ্গে রাজবাড়ীতে সুখে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লো।

অনন্তর চীনদেশের রাজা কনিষ্ঠা পুত্রবধূর মতানুসারে তাঁ'র মুক্তিদাতা বিজয় ও সুবোধকে কৃতজ্ঞতা জানা'বার জন্যে পাঁচ পাঁচটা কোরে চীন গড়নের দশটি খাঁটি সোণার কলসী উপহার পাঠিয়ে দিলেন। সেই দশটি কলসী ওজনে ⁄৫ হিসাবে ১।০ এক মণ দশ সের; দাম ২০ টাকা ভরি হিসাবে ৮০,০০০ আশী হাজার টাকা।

ধর্ম্মের জয়

—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ; আর তাঁহাদের কচি ছেলে-পুলে কয়টি লইয়া একটি ক্ষুদ্র পরিবার। ব্রাহ্মণ সত্যনিষ্ঠ ও সরল-স্বভাব ;—ব্রাহ্মণী সতীসাধ্বী পতি-ভক্তি-পরায়ণা ; কিন্তু দারুণ অন্নকষ্টের সজীব মূর্ত্তি সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারটির মধ্যে অহরহঃ বিদ্যমান।

ভিক্ষায় আর কুলায় না,—ভিক্ষা কেহ দিতে চায় না ; ভিক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ স্বভাবতই কুণ্ঠিত ; কেবল সন্তান কয়টির কারণে ভিক্ষায় যান, কিন্তু পান না ; যাহা পান, তাহাতে পতি-পত্নী অনশনে থাকিলেও সন্তান কয়টিরও অর্দ্ধাশন হয় না।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী আপনার অনশন সহ্য করিতে পারেন ; কিন্তু তীব্র ক্ষুধানলের দংশনে দুগ্ধপোষ্য কয়টিকে দগ্ধ হইতে আর কত দেখিবেন! দেখিয়া আর কতই বা সহিবেন! মা-বাপের প্রাণে হায়, কত আর সয়!

দরিদ্রতার দুঃসহ পেষণে ক্রমাগত নিষ্পেষিত হইয়া ব্রাহ্মণ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন, এবং এতাদৃশ অবস্থায় "মৃত্যুই শ্রেয়ঃ" বিবেচনা করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন ; ব্রাহ্মণীকে সবিশেষ কোনও কথা বলিয়া গেলেন না।

বিষণ্ণচিত্তে ব্রাহ্মণ যাইতেছেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসী-মহাত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী দেখিয়া ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া সেই সাধু সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন,—"বল বৎস! কি জন্য তুমি এমন বিষাদে অবসন্ন ?"

ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল-নয়নে উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি ; এ জীবন-ধারণে আর আমার বাসনা নাই ; কিন্তু আত্ম-হত্যা মহাপাপ, আপনি কৃপা করিয়া আমায় বলুন—কবে আমার মৃত্যু হবে ?"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,—বৎস! তুমি কি কারণে মৃত্যু কামনা করিতেছ ? তোমার সব কথা অগ্রে আমাকে সবিস্তারে বল, তারপর আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর সমীপে আত্ম-দরিদ্রতা সবিস্তারে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"দেব! এ দুরন্ত যাতনা আর সহিতে পারি না, সব সহিতে পারি ; কিন্তু দুটি অন্নের তরে অপোগণ্ড কয়টির আর্ত্তনাদ অসহনীয়।"

সন্ন্যাসীর হৃদয় প্রশান্ত, কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়; ব্রাহ্মণের করুণ-কাহিনী তিনি অক্লেশে শুনিলেন;—শুনিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"বৎস। তুমি সংসারী, সংসারে সুখ-শান্তি পাও নাই, সে তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ফল। স্বকীয় কর্ম্ম-ফলে ক্লিষ্ট হইলে তুমি হৃদয়ে কোন ক্রমেই বিশ্ব-সংসারের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে পার না, সংসারে বিরক্ত হইয়া মৃত্যু-কামনা করিবারও তোমার অধিকার নাই; তাহা করাও মহাপাপ অতএব দারিদ্র্য-দুঃখ যতই দুঃসহ হউক না, তুমি সে পাপ-সঙ্কল্পে প্রবৃত্ত হইও না; ইহা আমার সাগ্রহ অনুরোধ। পরন্তু এখন তুমি অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে পড়িয়াছ। অলক্ষ্মী যতদিন তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেন, ততদিন তোমার দারিদ্র্য ঘুচিবে না; সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া তোমার সহায়তা করিলেও তোমার অন্ন-কষ্ট নিবারিত হইবে না; ইহা নিশ্চয় জানিও।"

সন্ন্যাসীর বাক্যাবসানে ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"মহাত্মন্। তবে এখন উপায় কি?"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"এক উপায় আছে, কহিতেছি; মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও; গৃহে যাইয়া অলক্ষ্মীর এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার যথা-শাস্ত্র পূজা কর; পূজান্তে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিও না। প্রতিমাখানি নিজ মস্তকে লইয়া নগরের রাজপথে, লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে,—"কে অলক্ষ্মী লইবে"? যে লইতে চায়, তাহাকে অলক্ষ্মী-প্রতিমা দিয়া তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিবে; তাহার পর যাহা হয়, জানিতে পারিবে। কিন্তু যতদিন অবধি প্রতিমা কেহ না লয়, ততদিন গৃহে ফিরিও না।"

সন্ন্যাসীর কথাগুলি একাগ্রচিত্তে শুনিবার পর ব্রাহ্মণ কহিলেন—"ঠাকুর তা'ত বুঝিলাম; কিন্তু অলক্ষীর প্রতিমা যদি কেহ না লয়, তাহা হইলে আমি কি করিব? এ সংসারে কে অলক্ষ্মী লইবে? কেনই বা লইবে?"

"যদি একান্তই কেহ না লয়, তাহা হইলে তাহার উপায় বলিয়া দিব।" ব্রাহ্মণের কথার প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া ব্রাহ্মণীকে সব কথা কহিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া অলক্ষ্মীর-পূজার আয়োজন করিলেন। অলক্ষ্মীর প্রতিমা গঠিত হইল। কোঁস্তার খড়, বাঁটা-বাঁধা দড়ি, ভগ্ন বাঁশ, আল-পচা পুকুরের কাল কুট্‌কুটে কাদা দ্বারা প্রতিমা একমেটে ও দোমেটে করা হইল। প্রতিবেশীর উনুন হইতে ব্রাহ্মণী ছাই তুলিয়া আনিয়া দিলেন, (কারণ, নিজের উনুন প্রায়ই জ্বলে না), ব্রাহ্মণ সেই ছাই দিয়া অলক্ষ্মীর প্রতিমা চিত্র করিলেন,—লৌহ-অলঙ্কারে দেবীকে ভূষিতা করা হইল। শত-গ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন মলিন ন্যাক্‌ড়া-চোক্‌ড়া কৃষ্ণ অঙ্গার-চূর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেবীকে দিব্য বসন পরিধান করাইয়া দেওয়া হইল। ইত্যাকার অলক্ষ্মীর পূর্ণাবয়ব প্রতিমা ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথা-

রীতি অর্চ্চনা করিলেন। পূজান্তে প্রতিমা মস্তকে লইয়া সন্ন্যাসীর কথামত নগরে বহির্গত হইলেন।

"ওগো তোমরা কেউ অলক্ষ্মী নেবে গো" ব্রাহ্মণ হাঁকিলেন। প্রথম নম্বরে জবাব আসিল, "মর ড্যাক্‌রা বিট্‌লে বামুন,—দূর হও।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার হাঁকিলেন, 'ওগো গৃহস্থেরা তোমরা কেউ অলক্ষ্মী নেবে গো"—কেহ বলিল, "এ বেটা ক্ষেপেছে" ; "কেহ বলিল, "দাও বামুনকে দু-দশ ঘা বসিয়ে।"

এইরূপে দিনের পর রাত্রি গেল, রাত্রির পর দিন আসিল, সে দিনও গেল ; ব্রাহ্মণ কত গ্রাম, কত নগর, কত সহর, ফিরিলেন ; কিন্তু অলক্ষ্মী কেহ লইল না। কে এমন অভাগা ও আহাম্মক আছে যে, অলক্ষ্মী লইবে ?

বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। অলক্ষ্মী হইলেও দেবী-প্রতিমা ; বিশেষতঃ সে প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; পূজা করিয়াছেন, প্রতিমা মস্তকে, —না পারেন তাহা নামাইতে, না পারেন নিজে বসিতে ; অথচ দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, একি উৎকট বিভ্রাট! অনাহারের যাতনাও যে ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ শুনিলেন যে, নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের এক রাজা এক নূতন হাট বসাইয়া দামামা দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, সেই নূতন হাটে যে লোক যে কোন দ্রব্য লইয়া যাইবে, সে লোকের সে দ্রব্য যদি অবিক্রীত থাকে, রাজ-সরকার হইতে তাহা খরিদ করিয়া লওয়া হইবে। এক কথায়, সেই নূতন হাট হইতে কাহারও কোন দ্রব্য অবিক্রেয় হইয়া ফিরিবে না। ব্রাহ্মণ অলক্ষ্মী লইয়া রাজার নূতন হাটে উপস্থিত হইলেন।

হাটের সব দ্রব্য বিক্রয় হইয়া গেল, দোকানীরা সব দোকান-পাট তুলিয়া চলিয়া গেল ; হাট ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কিন্তু তখনও সেই অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি মস্তকে করিয়া হাট-মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছেন। হাটের গমস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি গো! তোমার মস্তকে উহা কি ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার মস্তকে ইহা অলক্ষ্মী, কই আমার ইহাকে ত কেহই লইল না ; এখন আপনারা আপনাদের ঘোষণানুযায়ী ইহাকে গ্রহণ করুন।" গোমস্তার প্রতি আদেশ ছিল বটে যে, হাটের লোকের যে দ্রব্য অবিক্রেয় থাকিবে, তাহা রাজ-ভাণ্ডারের অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া লইতে হইবে ; কিন্তু অলক্ষ্মী বা তদনুরূপ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন কি প্রকারে ? সেরূপ আদেশ কখনও তিনি পান নাই, আর অর্থ দিয়া অলক্ষ্মী ক্রয় করা আহাম্মকেরও কাজ বটে। কাজেই গমস্তা ঐ বিষয় দেওয়ানের নিকট পেস করিলেন। প্রশ্ন বড় কঠিন ; দেওয়ানও এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলেন না, তিনি রাজাকে জানাইলেন ; রাজা পড়িলেন বিষম সমস্যায়। একদিকে অলক্ষ্মী গ্রহণ,—অপর দিকে সত্যপালন। অলক্ষ্মী গ্রহণ না করিলে সত্য পালন করা হয় না, ধর্ম্ম নষ্ট হয় ; পক্ষান্তরে অভাগ্যের আকরভূতা অলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়া রাজ্যশ্রীই বা নষ্ট করেন কিরূপে!

বড়ই শক্ত কথা! রাজা কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকার পর, অলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়া সত্যপালন করাই স্থির করিলেন। কাঞ্চন-মূল্যে অলক্ষ্মী গ্রহণ করা হইল। ব্রাহ্মণ কাঞ্চন লইয়া গৃহে গেলেন; তাঁহার দারিদ্র্য মোচন হইল। এদিকে রাজা অলক্ষ্মী ক্রয় করিয়া মহাসমারোহে অভাগা-দেবীর পূজা করিলেন; তাঁহাকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; রাজার মনটি কিন্তু অত্যন্ত বিমর্ষ হইল।

বিষাদে ম্রিয়মাণ রাজা সে রাত্রি আহার করিলেন না; অন্তঃপুরেও গেলেন না। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল; সব লোক নিদ্রিত; সেই নিশীথ-সময়ে একাকী রাজা বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল কতই ভাবিতেছেন?

বহুক্ষণব্যাপিনী চিন্তার পর রাজা একবার চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন; চাহিয়া চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন, এক স্ত্রী-মূর্ত্তি অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্বারের দিকে আসিতেছেন। দিব্য তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণা সুরূপা এক সুন্দরী, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, কৌষিক-পট্টবস্ত্রপরিহিতা স্ত্রী-মূর্ত্তি অদূরে এই মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য রাজা চমকিত, স্তম্ভিত ও কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন। রাজার অন্তঃকরণে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। নিশীথ-সময়ে একি দৃশ্য! শঙ্কা ও সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান রাজা এ ব্যাপারের শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্রমে নারীমূর্ত্তি নিকট হইতে আরও নিকটে আসিলেন, ক্রমে সম্মুখে সমুপস্থিত,—সম্মুখ হইতে সুন্দরী চলিয়া যান; রাজা তখন গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?" সুন্দরী মধুর-কোমল-কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমি এই রাজ-প্রাসাদের রাজলক্ষ্মী; বহুদিন হইতে এখানে বাস করিতেছিলাম; কিন্তু চলিলাম।" রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"কেন মা আপনি যাইতেছেন? এই সাম্রাজ্যের সর্ব্বমঙ্গলময়ী অধিকারিণী আপনি; আপনি যাইতেছেন গৃহ ছাড়িয়া কেন যাইবেন?" লক্ষ্মী প্রত্যুত্তর করিলেন, "কেমনে আর আমি এই স্থানে থাকিব?—রাজা স্বয়ং অলক্ষ্মী আনিয়া এই গৃহে স্থাপিত করিয়াছেন; যেখানে অলক্ষ্মীর বাস, সেখানে বৎস! আমি কোন ক্রমেই থাকিতে পারিব না।"

রাজা সব বুঝিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন,—"মা এই অভাগার প্রণিপাত গ্রহণ করুন্; আপনি যখন এখানে আর থাকিতে সম্মতা নহেন, তখন আর কি বলিব, যদৃচ্ছা গমন করিতে পারেন।"

লক্ষ্মী চঞ্চলচরণে চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমাত্র অতীত হইতে না হইতে এক দিব্য পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারে দেখা দিলেন;—হিরণ্ময় বপুঃ, শঙ্খ, চক্র এবং গদা-পদ্ম-যুক্ত কেয়ূর ও কনক-কুণ্ডল-সমন্বিত মহারব! রাজা প্রণিপাত পূর্ব্বক যুক্তপাণি ও গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবন্! আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন?"

দিব্যপুরুষ উত্তর করিলেন, "আমি বিষ্ণু,—নারায়ণ; আমি লক্ষ্মীর অনুসরণ করি-

তেছি, যে স্থলে লক্ষ্মী নাই, সে স্থলে ত আমার বাস করা হইতে পারে না। যথায় লক্ষ্মী, তথায় আমি।"

রাজা পুনঃ প্রণাম করিয়া নারায়ণকে বিদায় দিলেন। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাকে রাজা বহির্দ্বারে বসিয়া একে একে প্রণাম করিয়া বিমর্ষভাবে বিদায় দিলেন। সর্ব্বশেষে শুভ্র-বসনাবৃত সুদীপ্তকান্তি এক মহাপুরুষ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা প্রস্তুত ছিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—"সকলেই ত গিয়াছেন, এখন আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন—বলুন।" মহাপুরুষ কহিলেন, "আমি ধর্ম্ম। দেবতারা সকলে গিয়াছেন ; এখন আমি যাইতেছি।"

রাজা ধর্ম্মের বাক্যাবসান না হইতেই তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া ধর্ম্মের পদযুগল স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চাইতেছেন, তা যাউন। সত্যপালন করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষার্থেই আজ এই রাজ-অট্টালিকায় আমি অলক্ষ্মী আনিয়াছি। রাজ্যশ্রী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এখন হে ধর্ম্ম! আপনি আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। তা বেশ, আমার ধর্ম্ম আমি যথাসাধ্য পালন করিয়াছি ; এখন আপনার ধর্ম্মে যাহা উত্তম বুঝিতেছেন, তাহাই করুন্। আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই।"

ধর্ম্ম বড় "ফাঁফরে" পড়িলেন ; হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিতচিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন! সব দেবতারা চলিয়া গিয়াছেন, রাজা একে একে অনায়াসেই সকলকে বিদায় দিয়াছেন, কেবল ধর্ম্মকেই রক্ষা করিবার জন্য। ধর্ম্মের আর পা চলিল না। ধর্ম্ম বলিলেন, "বৎস! অজ্ঞাতে আমি অকৃতজ্ঞের মতই কাজ করিয়াছি। তা, তুমি আক্ষেপ করিও না, তুমি আশ্বস্ত হও। অন্যান্য দেবতারা গিয়াছেন, যাউন ; আমি তোমায় কোন কালেই ছাড়িব না। আমি আবার স্বস্থানে চলিলাম।'—বলিয়া ধর্ম্ম রাজ-পুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা তখনও উঠিলেন না ; পূর্ব্ববৎ সিংহ-দ্বারেই বসিয়া থাকিলেন। অনতিবিলম্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সমস্ত দেবতা একে একে পুনর্ব্বার সিংহ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কি গো মহাশয়গণ! আপনারা এখনি আবার কোথায় চলিয়াছেন?" দেবতারা বলিলেন, "আমরা পুনরায় এই রাজ-পুরীতে প্রবেশ করিতেছি ; ধর্ম্মকে ছাড়িয়া আমরা কেমনে যাইব—যাইতে পারিলাম না, তাই আমরা আসিয়াছি।" "যে আজ্ঞা, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়" বলিয়া রাজা সকলকে সমাহ্বান করিয়া পুরে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বশেষে সুগন্ধি ঝাঁপিটি কক্ষে করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়া আবার উপস্থিত।

রাজা। মা! আবার এলেন কি?

লক্ষ্মী। "হাঁ, বাছা! যাওয়া হলো না।" "আসুন, মা ; এ সবই যে মা আপনারি" বলিয়া লক্ষ্মী লইয়া রাজা পুরে প্রবেশ করিলেন।

প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন

—ক্ষেত্রনাথ গুপ্ত

একটা বড় বাড়ীর দোতলায় বড় হল। বাড়ী বাঙ্গালীর বটে, কিন্তু সাজান ইংরাজী ধরণে। আসবাবের সব কথার উল্লেখ করিতে গেলে মেকেঞ্জিলায়ালের একস্‌চেঞ্জের ক্যাটালাগ তৈয়ারি করিতে হয়। কিন্তু যখন প্রথমেই ঘরের কথা তুলিয়াছি, তখন সে সম্বন্ধে দু-চারিটা কথা না বলিলেও দোষ হয়। ঘরের মেজে ম্যাটিং করা। ঘরের লম্বাভাগের দুইদিকের প্রতি ভিতের কোলে মার্বেল পাতর ঢাকা মেজ ; তাহার উপর গোল বাদামে কাচাবরণের ভিতর প্যারিয়ন মূর্ত্তি ; কেহ জেসন, কেহ ইউনা, কেহ ভিনস, কেহ এডনিস্‌। মূর্ত্তিদের কিছু উৰ্দ্ধে দেয়ালের গায়ে বহুমূল্য ফ্রেমে আঁটা অয়েল-পেন্টিং—সবগুলাই বিলাতি দৃশ্য।

ঘরের অন্য আসবাবের মধ্যে শেষ প্রান্তের দেয়ালে একখানা প্রকাণ্ড আরসি তাহার ভিতর প্রতিবিম্বে ঘরটা দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আরসির কোলে একটা প্রকাণ্ড মেহগনি সেফ্‌নার—একখানা প্রকাণ্ড শ্বেত মার্ব্বেল পাতর ঢাকা। তাহার উপর কাচাবরণের ভিতর একটা বহুমূল্য ছোট ঘড়ী। ঘরের মাঝখানে একটা বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিল—পাশে একটা হোয়াট্‌নট, তাহার উপর কতকগুলা চকচকে সোনালি কাজ করা বিলাতি বই। টেবিলের আশেপাশে অনেকগুলা, নানামূর্ত্তি চেয়ার। তাহাদেরই ভিতর স্প্রিং-মোড়া একখানার উপর বসিয়া, কাল চসমাচোখে, সমুখের-দাঁত-উঁচু নেপাল।

মনে পড়ে—একবার একজন আধা-বাঙ্গালী, আধা-ফিরিঙ্গি গোছ ক্রিশ্চান বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছিল,—"অনন্তর সেই পথিক, আতপতাপে তাপিত, পথশ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া দ্রুতপদে এক কুঁড়ের ভিতরি ঢোকলো।" সে বেচারী শুধু ভাষার উপর অত্যাচার করিয়া সে দিন যে অপরাধ করিয়াছিল, আজ আমার অপরাধ তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। আমি ঠিক বুঝি যে, আসবাব-সমেত ঘরের এতখানি বিস্তৃত বর্ণনার পর আমার লেখা উচিত ছিল,—"একখানা বড় স্প্রিংকৌচের উপর অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় কন্দর্পনিন্দিতকান্তি এক সুপুরুষ যুবা—হাতে একখানা অৰ্দ্ধমুক্ত পত্র, বোধ হয় রমণীর লেখা।" তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকিত—এবং সেই ক্ষুদ্র চিঠি-বীজের উপর যত্নে কিঞ্চিৎ কল্পনাবারি ঢালিতে পারিলে, চাই কি ভবিষ্যতে উহা একটা প্রকাণ্ড ট্র্যাজিডী-বটবৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত। বুঝি সব, কিন্তু আমি নাচার। কারণ গোয়াড়ি-

কৃষ্ণনগর-নিবাসী যে কৃষ্ণকায় দন্তুর নেপালচন্দ্রের ৩২।১—ঘোষের লেনের ছাত্রাবাসে হাল হাকিম, তাহাকে আজ একজন ধনীর সুসজ্জিত গৃহে গদিমোড়া চেয়ারে বসিতে দেখিয়া সাহিত্যের কোন্ নিয়মে রমেন্দ্রনাথ বা ত্রিদিবেন্দ্র বলিয়া ডাকি, এবং সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করি। তবে যে পাঠক একেবারে দমিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ভরসা দিবার জন্য বলি, নেপাল এ বাড়ীর প্রাইভেট টিউটর। প্রাইভেট টিউটর নেপাল হইলে তত দোষ হয় না; কেমন!

নেপাল এবার বি-এল পরীক্ষা দিবে। উপরে যে বাসার কথা বলিয়াছি, সেইখানেই অবস্থিতি। সকালে ল-ক্লাসে যায়—দুপুরে ল-বই পড়ে—সন্ধ্যার সময় এই বাড়ীতে পড়াইতে আসে। মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা। দেশে বিধবা মা, বুড়া জেঠা, জেঠাই, তাঁদের দুটি ছেলে। আজ কিছু অধিক তিন বছর বিবাহ হইয়াছে। গত মাঘমাসে বারাসাতের নিকট বাদুগ্রামে পিত্রালয় হইতে একটা দুই মাসের শিশু লইয়া পত্নীও শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়াছেন। পূর্ব্বে নেপাল মাসে একবার বাড়ী যাইত,—পরীক্ষা কাছে হইলেও মাঘ মাসের পর হইতে নেপাল দুবার বাড়ী যায়। দেশে কিছু জমী ও কয় ঘর প্রজা আছে। জেঠার বড় ছেলেটী তাই দেখে শুনে। যে আয় হয়, নেপাল তাহার উপর মাসে ৮৲ টাকা করিয়া পাঠায়;—মোটা ভাত কাপড়ে একরকমে দিন চলিয়া যায়।

যে নেপালের ছাত্র, সে বড় লোকের পৌত্র। একটা মস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেক উত্তরাধিকারী। নাম প্রমথনাথ—বয়স সতর। ইস্কুলের শিক্ষার অনেক দোষ, এইরূপ বুঝিয়া, অনেক দিন ইস্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। ঠাকুরদাদার তাহাতে সম্পূর্ণ মত না থাকিলেও—দায়ে পড়িয়া তখন তাঁহাকে নীরব থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন একদিন দেখিলেন, যেখানে আগে স্কুলের বই সাজানো থাকিত, সেখানে একটা ছোট সেতার আড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার পায়ের কাছে একজোড়া বাঁয়া তবলা—দুটিতে চুপ করিয়া মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে—এবং যে ঘর হইতে, পূর্ব্বে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক,—"Asia is bounded on the north by the Arctic ocean" কিম্বা "because the side B D is equal to the side A C therefore the angle" ইত্যাদি শব্দ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌছিত, সেই ঘর হইতে অনবরত "কধেটে ধেটেতা, গধিনা ধিনতা, এবং ডা ডেরে, ডারে ডারে" শব্দ উত্থিত হইতেছে, তখন তিনি সেটাকে একটা বিশেষ দুর্লক্ষণ মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ভায়ার এখন পড়াশুনা হউক না হউক, কোনরূপে যদি লেখাপড়ায় একটু প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উপকার হইতে পারে। কিন্তু সেটা যে সহজসাধ্য নয়, তাহাও বুঝিলেন। আপাততঃ শুধু একজনের প্রয়োজন, যে তাহাকে বাঁয়া তবলা সেতার হইতে দূরে, বৈঠক-খানায় কালি-কলম বইএর কাছে খানিকক্ষণ ভুলাইয়া আবদ্ধ রাখিতে পারে। তখনি ঐরূপ একজন পাহারাওয়ালা প্রাইভেট টিউটরের খোঁজ পড়িল। বাটীর সদরনায়েব শ্রীকান্তের কৃষ্ণনগরে বাড়ী—নেপালের প্রতিবেশী।

ঐ সময়ে তাহার নেপালের নামটা মনে পড়িয়া গেল—খোঁজ করিয়া নেপালের বাসায় গিয়া দেখা করিল। নেপাল ভাবিল, মন্দ নহে—ক্ষতি কি, কুড়িটা টাকা। সেই অবধি নেপালের প্রাইভেট টিউটর ভাবে এই বাড়ীতে যাওয়া আসা।

প্রথম প্রথম নেপাল ভাবিল, যাহাতে আমার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি না হয়, এইরূপ করিব ; দেখি, কতদুর পারি। এইরূপ বুঝিয়া একদিন নেপাল গায়ে জিনের কোট আঁটিয়া, লাংক্লথের চাদর গায়ে দিয়া একখানা "Herbert Spencer on Education" লইয়া হাজির হইল। এক কোর্স লেকচার দিবার ইচ্ছা। যখন ছাত্র কাছে আসিয়া বসিল, তখন নেপাল গম্ভীর ভাবে চসমা চোকে দিয়া আরম্ভ করিল, "প্রমথ! বোধ হয় তুমি এই বইয়ের অথরের নাম শুনেছ। ইনি বিলাতের, বিলাত কেন সমস্ত ইয়ুরোপের ভিতর যে সকল বড় বড় চিন্তাশীল লেখক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন।" ছাত্র বইখানা একবার হাতে করিয়া লইল—উলটাইয়া পালটাইয়া তাহার মলাটখানা দেখিল—একবার ভিতরের পাতা খুলিল, দেখিল ছবি আছে কি না, শেষ—ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ মাষ্টার মহাশয়! ইনি কি যে স্পেন্সার সাহেব বেলুনে উঠেছিলেন, তাঁর ভাই?"

নে। (গম্ভীর ভাবে) হতে পারে, তাঁর সঙ্গে কোন দুর family relation থাকিতে পারে। কিন্তু আমি সে কথা বলচি না।

প্র। আপনি Sir বলচেন ইনি বড় লোক। এঁর বই কি করিন্থিয়ান থিয়েটারে act হয়? তা হলে একদিন দেখে আসি।

নে। এখানা নাটক নয়। শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সার সাহেব যাহা বুঝিয়াছিলেন ও চিন্তা করিয়াছিলেন—ইহা সেই চিন্তার ফল।

প্র। (বাধা দিয়া) আপনি ইংলিশ থিয়েটারে কখন গিয়াছেন? ওঃ! আজ—শনিবার, আজ East Lynne play হবে। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই। নেপেনও যাবে বলেছে।

নেপালচন্দ্র হতাশ হইয়া সেদিন ফিরিলেন।

কিন্তু শীঘ্র নেপাল আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাহার পর হইতে ছাত্রের সহিত ব্যবহারেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। দুই তিন মাসের ভিতরই নেপাল, ছাত্রের থিয়েটার, সার্কাসে, টেনিসপার্টিতে এবং বৈকালে Eden Gardenএ বেড়াইবার সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরদাদা ভাবিতেন, "ভয় নাই—বি-এ পাশ, শিক্ষিত মাষ্টার সঙ্গে থাকে—ওগুলা আধুনিক শিক্ষার একটা অঙ্গ।" নেপালের বাসার সঙ্গীরা দেখিল, নেপাল বদলাইতেছে।

ইদানীং পড়াশুনার ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। একদিন হয়ত ছাত্র পেয়ালের মুখে বলিল, "মাষ্টার মহাশয়! Shakespeare কি বড় শক্ত? বুঝা যায় না?"

নে। কিছু না! তোমার যেরূপ বুদ্ধি—একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পার।

তার পরদিন বিকালে ইডন্‌গার্ডনে যাইবার সময় Thacker-এর দোকান হইতে একসেট Shakespeare কেনা হইল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তবে যেদিন কোন বিলাতী থিয়েটরে উহাদের মধ্যে কোন নাটকের অভিনয় হইত, সেই দিন দুপুরবেলা বইখানা আলমারি হইতে পাড়া হইত। নেপাল রিডিং পড়িত—ছাত্র চেয়ারে হেলান দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বলিত, "হুঁ হুঁ।" সব সময়েই ঐ ভাব। তবে নেপালের কুড়ি টাকা ঠিক সময়ে আসিয়া পকেটে পৌঁছিত। ঠাকুরদাদ ভাবিতেন, "বাঃ, মাষ্টারের গুণ আছে। প্রায় এক আল্‌মারি নূতন বই কেনা হইয়াছে।

আজ Tennysonএর Locksley Hall পড়া হইবে। মাষ্টারের মুখে ছাত্র শুনিয়াছে Tennyson বিলাতের বড় কবি—রাজ-কবি। আর Locksley Hall একটা famous piece। দুইখানা বই খোলা হইয়াছে। একখানা ছাত্রের কাছে—আর একখানা নেপালের হাতে। ইতিপূর্ব্বে আধখানা সিগার ও গোটাপঁচিশেক "হুঁ"র সঙ্গে প্রথম আট লাইন শেষ হইয়া গিয়াছে। নেপাল পড়িতেছে :—

"Many a night I saw the Pleiads rising through the mellow shade"

ছাত্র সিগার মুখে তুলিয়া, ধুম টানিতে টানিতে বলিল, "Pleiads কি Sir?"

নে। বাঙ্গালায় যাহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে।

ছা। সে কি?

নে। কতকগুলা নক্ষত্র।

ছা। আচ্ছা মহাশয়! ঋষিরা কি মরিয়া আকাশে নক্ষত্র হয়? তাহা হইলে আকাশটিত একটি প্রকাণ্ড নৈমিষারণ্য।

নে। (জোর করিয়া হাসিয়া) অতি পরিষ্কার। তোমার mother wit আছে।

ছাত্র খুসী হইল। বলিল, "চলুন, আজ রাঙ্কিনের বাড়ী এক ডজন সার্টএর ফরমাস দিয়া আসি। আপনিও সঙ্গে সঙ্গে গায়ের মাপটা দিবেন। ফিরিবার মুখে গ্রেট-ইষ্টার্ণ হয়ে আসব।" তখনি টমটম তৈয়ার হইল। যেখানের বই সেইখানেই খোলা পড়িয়া রহিল।

কুড়ি টাকা মাহিয়ানা ছাড়া আজকাল ঐটুকু নেপালের উপরি লাভ। তবে কিছু লোকসানও ছিল।

বিবাহের পর, পূজার সময় নেপালের শ্বশুর একবার ভাল বার্ণিস ৬৷৭ টাকা দামের একজোড়া জুতা দিয়াছিলেন। আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া নেপাল লজ্জায় সে জুতা পায়ে দিতে পারে নাই। তবে শুনিয়াছি রাত্রিতে বাসার লোক ঘুমাইলে কোন কোন দিন উহা পায়ে দিয়া চুপিচুপি ছাতের উপর বেড়াইত। কিন্তু এই ৪৷৫ মাসের ভিতর নেপালের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জিনের কোট ছাড়িয়াছে—প্রথমে আদ্দির সার্ট,

ক্রমে ওয়েষ্টকোট, কলার—শেষে নেক্টাই, মাথায় টেনিসক্যাপ। লজ্জা একবার ভাঙ্গিলে আর কতক্ষণ! আট মাস পূর্ব্বে দর্জি টিপু যে ছাতির লৌহকঙ্কালের উপর নূতন কাপড়ের ছাউনী বসাইয়া অনেক কষ্টে ৫।৭ দিন হাঁটিবার পর বাদসাদ দিয়া পাঁচ আনা তিন পাই আদায় করিয়াছিল, এখন বাসায় পাচক উড়ে কুণ্ডুরি তাহা মাথায় দেয়। নেপালের হাতে ৬।।০ টাকার সিল্কের ছাতি। বাসার তক্তপোষের স্থানে খাট আসিয়াছে—কাপড়ের তোরঙ্গ ঝি লইয়াছে—সেখানে বসিয়াছে আরসিওয়ালা ফ্যান্সি দেরাজ। একদিন—সেও বেশী দিনের কথা নয়—নেপালের বোধ হইয়াছিল এসব অর্থসাপেক্ষ আড়ম্বর খুব অনাবশ্যক—দরিদ্র সন্তানের পক্ষে পাগলামি। এখন নেপালের বোধ হয় এ সকল না হইলে সংসার চলে না। ইহার উপর নেপাল একটা ক্লাবের মেম্বর হইয়াছে। সেখানে মাসে মাসে টাকা দিলে লেমনেড, বরফ ও চুরুট পাওয়া যায়, বিলিয়ার্ড খেলিতে পাওয়া যায়, আর ২।৪ মাস অন্তর river trip এ নিমন্ত্রণ হয়। কিন্তু এ সকলে পয়সা চাই—কুড়ি টাকা মাহিয়ানার ভিতর বাসার খরচ চালাইয়া ও বাড়ীতে আট টাকা পাঠাইয়া বজায় রাখা অসম্ভব। নেপালের কিছু দেনা হইল।

* * *

যখন এতদূর হইল, তখন হোটেল ভোজনে আর বিশেষ আপত্তি রহিল না। কিন্তু সে খরচ প্রায় সকল সময়েই ছাত্র বহন করিত। ২।৩ মাসের ভিতর নেপাল কাঁটা চামচে সড় গড় করিয়া লইল। বছরের শেষে নেপালের বোধ হইল স্ত্রীর রংটা আর একটু ফর্সা হইলে ও সে আর একটু লেখাপড়া জানিলে ভাল হইত।

একদিন শীত রাত্রে প্রকাণ্ড বনাতের অলষ্টার গায়ে দিয়া, বুট আঁটিয়া, টেনিস ক্যাপ মাথায় দিয়া ** হোটেলের গ্যাসালোকিত একটা কামরায় বসিয়া গরম কটলেট খাইতে খাইতে নেপালের মনে হইল—"আঃ! কি সুখ কি সম্ভ্রম! কোথায় গোয়াড়ির পাড়া-গেঁয়ে বাড়ী—ঘরের কোণে পিলসুজের উপর মিট মিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে—আর কোলের কাছে থালা টানিয়া লইয়া মুগের ডাল দিয়া ভাত সাপ্টানো। হয়ত ছেলেটা দুধ খাইবে না, কান্না ধরিয়াছে—আর রাঙ্গা কস্তাপেড়ে কাপড় জড়ানো স্ত্রী তাকে কোলে ফেলিয়া হাঁটু দোলাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক দিয়া দুধের বাটিতে ঠং ঠং আর মুখে "আয়রে ও আয়রে" শব্দ করিতেছে—ছি! ছি!!—আর আজ কোথায়। টেবিলের কাছে ব্লু কর্সেট পরিয়া ও কে? নাম শুনিলাম Miss Allen—মরি মরি! কি রূপ! She can well sit for Hebe. বা! কি bland and gracefull smile—good Heavens! কোন ভাগ্যবান পুরুষের—যাক কাজ নাই।

দুই তিন মিনিটের ভিতর নেপালের মনে এতগুলা কথার উদয় হইল। কিন্তু তখনি মনে হইল আর আধ ঘণ্টা পরেই এই টেবিল, এই গ্যাসালোক, এই বাবুর্চির দল ছাড়িয়া ঐ ব্লু কর্সেট হইতে অনেক দূরে সুধু ঐ bland smile-এর স্বপ্নটুকু লইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু নেপাল সহজে দমিবার ছেলে নয়। তাহার আবার মনে হইল সে তিনটা

পাশ করিয়াছে—সে বুদ্ধিতে অনেকের চেয়ে বড়। চেষ্টা করিলে কি গ্যাসালোক নিজের ঘরে জ্বালানো যায় না? কিম্বা এই কটলেট কাবাব নিত্য ভোজ্য হয় না? অথবা এই liveried waiter দরজায় দাঁড়া রাখা যায় না? আর এই ব্লু কর্সেট ও হাসি কি চিরকালই স্বপ্নের বস্তু থাকিবে? কেন স্বপ্নও ত সফল হয়। শুধু বুদ্ধি আর চেষ্টা! নেপালের মাথায় চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি যোগাইল।

যখন নেপাল এণ্ট্রান্স পাশ হইয়া কলিকাতায় এফ্-এ পড়িতে আসে, তখন এক এক দিন ছুটির দিনে দুপুর বেলা যখন বাসায় সকলে ঘুমাইত, চুপিচুপি বাসার ছাতে গিয়া বসিত। হয় ত হাতে পয়সা নাই যে ট্রেন ভাড়া দিয়া বাড়ী যায়। তখন দূরে কলিকাতার পূর্ব্বসীমায় যে শ্যামলরেখার ন্যায় ঘন সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যায়—নেপাল স্থির, মুগ্ধ-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। ঐ তালগাছ, উঃ কত দূরে? ওটা নিশ্চয়ই পাল-পুকুরের পাড়ের সেই গাছটা। তখন সমস্ত গ্রামখানা নেপালের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিত—আর সঙ্গে সঙ্গে কত দিনের কত কথা—শৈশবের ছুটির দিন—বিজন মধ্যাহ্ন—বাল্যসাথী—সেই দুপুর বেলা, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, শৈলেনদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাস খেলা, আর সেই বৈকালে নালার মাঠের কোলে ইটের সাঁকোয় বসিয়া গ্রাম্য গান—কি মুক্ত স্বাধীনতা! কি উদার আনন্দ! চাহিয়া চাহিয়া নেপালের চোক জলে ভরিয়া আসিত। কোন কোন দিন কোঁচায় মুখ ঢাকিয়া নেপাল বালকের ন্যায় কাঁদিত। তখন নেপাল ভাবিত, যদি কখন বি-এ পাশ হইতে পারে ত দেশে গিয়া, দেশের ইস্কুলেই ৫০।৬০ টাকার মাষ্টারি করিবে। তাই যথেষ্ট। কলি-কাতার নাম আর মুখে আনিবে না। ক্রমে যখন বি-এ পাশ হইল তখন ভাবিল বি-এলটাও দিই। কিন্তু কলিকাতার ওকালতী করা হইবে না। দেশে মুন্সেফি আদালত আছে, বেশী উকীল নাই। মাসে ১০০।১৫০ দেড় শত টাকা পোষাবেই। তবে আর দুঃখ কি! এর অধিকই বা কি আশা করিতে পারি। কিন্তু যে দিন তক্তপোষের স্থানে খাট আসিল, তোরঙ্গের কাপড় ড্রয়ারে প্রোমোশন পাইল—গটাপার্চ্চা আস্কির সাট জিনের কোটকে ভিটাছাড়া করিল, তার পর হইতে নেপালের মনে অনেক নূতন কথার উদয় হইতে লাগিল। **Maine on Hindu Law**র পাশে নীল উঁচুপেন্সিলের দাগ মারিতে মারিতে নেপালের প্রায়ই মনে হইত, যাঁরা হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন তাঁরা সকলে উকীল ছিলেন—আর তাঁরা দুই হাত পা বিশিষ্ট মানুষের বেশী কিছু নহেন। আজ রাত্রে অলষ্টার গায়ে দিয়া, গ্যাসালোকিত ঘরে, অনেকগুলা হ্যাট কোট ও গাউনের সালোক্যে বসিয়া উঁচু দাঁতের নিচে ঠোঁটের উপর ফ্রেঞ্চ ফ্যাসানে ছাঁটা দাড়ী চুমরাইতে চুমরাইতে নেপালের আর একটা নূতন কথা মনে হইল।

সে রাত্রিতে টমটমে করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় মাষ্টারে ছাত্রে অনেক কথা হইল। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর শ্বাশুড়ী ঘুমাইয়াছেন। নেপালের স্ত্রী ছেলেটিকে কোলের কাছে লইয়া আপনার ঘরে শুইয়াছে। বাপের বাড়ী হইতে আসিবার সময়

এক শিশি কুন্তলবৃষ্য তেল আনিয়াছিল। নিজের মাখিবার ভরসা হইত না পাছে শ্বাশুড়ী রাগ করেন। তবে যে দিন নেপাল বাড়ী যাইত, সেই দিন রাত্রে ঘরে যাইবার সময় চুরি করিয়া একবিন্দু লইয়া খোঁপায় মাখাইত ; তাও একটু বেশী করিয়া মাখিবার সাহস হইত না, যদি সকালে শ্বাশুড়ী টের পান। আজ সেই তেল একটু ঢালিয়া খোকার কেশ-বিরল মাথায় মাখানো হইয়াছে—এবং সেই চুলে সিঁথি কাটিয়া দিয়া চোখে কাজল ও গালে ঠোঁটে আলতা দেওয়া হইয়াছে। খোকার এত সাজ হইয়াছে—কিন্তু তবু আজ মনটা কেমন ভার-ভার। আজ প্রায় এক মাস নেপাল বাড়ী যায় নাই, আর ১৫।১৬ দিন কোন পত্রও পাঠায় নাই। এত দিন একখানা চিঠির আশায় হা-পিত্যেশ করিয়া আজ মনটা কেমন বেশী ভার হইয়া উঠিয়াছে। মনে কত দুর্ভাবনা—কত অলক্ষণে কথা আসে। তাই শুধু অন্যমনস্ক হইবার জন্য খোকার আজ এত যত্ন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যখন ঘুমাইবার আগে খোকা ছোট ছোট, গোল গোল হাত পা দুপদাপ করিয়া ছুঁড়িতেছিল আর মুখে "বু-ব্বা, বা-ব্বা" শব্দ করিতেছিল, তখন শতবার চোখের জল অসামাল হইয়া পড়িতেছিল। কেবল মনে হইতেছিল, "আমি যেন পোড়ারমুখী, কালো কুৎসিত, তাঁর মনের মত নই—কিন্তু বাছা আমার কি দোষ করেছে ? তাকে কি একবারও মনে পড়ে না—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না ?" আর চোক মুছিয়া মুছিয়া আঁচলটা ভিজিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় হরকরা ডাকিল "চিঠি !" ছোট দেওর চিঠি আনিয়া হাতে দিল। তখন বউদিদির প্রাণটা উঠিয়া তালুতে ঠেকিয়াছে। চিঠি খোলা হইল। তাহাতে লেখা ছিল—

আদরিণী—

বড় তাড়াতাড়ি। সব কথা গুছাইয়া লিখিবার সময় নাই। মোটের উপর জানিও আমার সঙ্গে ৩।৪ বৎসর দেখা হইবে না। আমি বিলাত যাইতেছি। ব্যারিষ্টার হইব। ফিরিলে তোমার দুঃখ ঘুচিবে। আমার বিদ্যা বুদ্ধি আছে, দেশে থাকিয়া তাহা কেন নষ্ট হয়। এখন তুমি যাহাই ভাব, শেষে বুঝিবে আমি একটা মানুষের মত কাজ করিয়াছি। টাকার যোগাড় হইয়াছে। যাহাকে পড়াই সে বড়লোকের ছেলে—সেও আমার সঙ্গে যাইবে। আমার খরচ সেই দিবে। খুব গোপনে পরামর্শ স্থির হইয়াছে, কেহ টের পায় নাই। তুমি এই কটা দিন চুপচাপ করিয়া কাটাইয়া দাও। তার পর দেখিও কি কাণ্ড। তোমার মাথায় এখন আসিবে না। তোমাকে ভালবাসি, মার চেয়েও, তাই তোমাকে কথাটা জানাইলাম। মাকে এখন কিছু শুনাইও না, আমার দিব্য আমি চলিলাম—

তোমার
নেপাল
ইংরাজীতে, N. Paul.

পুঃ

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ ইংরাজী নামই ব্যবহার করিব।

দেবর হরিধন গিয়া নেপালের মাকে বলিল, "খুড়িমা, ওঠ, কলকাতা হ'তে দাদার চিঠি এসেছে।" খুড়িমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোক মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বৌমা! ন্যাপাল, বাছা আমার ভাল আছেত, কৈ কি লিখেছে?"

বৌমা চিঠিখানা দেবরের হাতে দিয়া ঘোমটা টানিয়া ছেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শ্বাশুড়ীর মাথায় বাজ পড়িল।

সব ঠিক। **P. & O.** কোম্পানীর বাড়ী হইতে বিলাত যাইবার রাহাখরচের ও রসদের হিসাব আনানো হইয়াছে। র‍্যাঙ্কিনের বাড়ী **Suit**এর ফরমাস গিয়াছে। এখন কেবল স্বপ্নে স্বপ্নে দিন তার কাটিতেছে। বাঙ্গালা ইংরাজী বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে যত কিছু বই বাহির হইয়াছে সবই কেনা হইয়াছে। তাহারা দিনরাতের সঙ্গী। দস্তরমত তারিখ দেওয়া মরক্কো লেদার ঢাকা সোনা বাঁধানো একখানা **Diary**ও আসিয়াছে। তাহাতে নেপাল বা ভবিষ্যৎ **N. Paul** সাহেবের বিলাত-জীবনের একটা ঠিকুজী প্রস্তুত হইবে। এবং আবশ্যক হইলে যে উহা কোন দীনহীন, উপোষিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের খোরাক, কিম্বা কোন সৎ-সাহসী, সাহিত্য-সেবক, সত্যপীর সংবাদপত্রের গ্রাহকগণের জন্য বিনামূল্যে দত্ত সিন্নিতে পরিণত হইতে পারিবে না, এমন নহে। যাহা হউক একটা সুখময় উৎকণ্ঠায় দিন কাটিতে লাগিল। নিদ্রায় জাগরণে স্বপ্ন—গ্যাসালোকিত হল-মসৃণ কাঠের মেজে—তাহার উপর আবর্ত্তমান জোড়া জোড়া পা-গাউনের খস্ খস্, পিয়ানোর গোঁ গোঁ—আর পক্ষহীন পরীর মেলা। মরি মরি কি দেশ! শুধু কল্পনায় যে সুখ তাহাতে যে মত্ততা জন্মে—সত্য সত্য সে আরব্য উপন্যাসের দেশে কি হয় বুঝিতে পারি না। উঃ—১৭ই তারিখের যে এখনও ছয় দিন দেরী। দিনগুলো এত বড় ঠেকিতেছে কেন?

কিন্তু গোড়ায় গলদ। জাহাজ ছাড়িবার আর ৪ দিন আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত টাকা যোগাড় হয় নাই। সেখানে একবার পৌঁছিতে পারিলে হয়, তারপর ঠাকুরদাদাকে চিঠি লিখিলেই চলিবে। সত্য তিনি কিছু পৌত্রকে বিদেশে অনাহারে মরিতে দিবেন না। কিন্তু যাইবার খরচ মিলে কোথা? অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন রাহাখরচের একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই, তখন পৌত্র ঠাকুরদাদার কাছে কথাটা একবার ভাঙ্গিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতে পিতামহের স্বভাব বেশ বুঝিত। মনে ঠিক জানিত সাফ কবুল করিলে, ফল বিপরীত হইবে। অন্য শত বিষয়ে স্নেহশীল পিতামহ পৌত্রের অনেক অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিলেও এ বিষয়ে কখন সম্মতি দিবেন না। অধিক কি, যদি পালাইবার কোন পথ থাকে তাহাও বন্ধ করিয়া দিবেন। কিন্তু এত দূর আসিয়া ফেরা অসম্ভব, যাইতেই হইবে।

তবে উপায়! নেপালের বুদ্ধি বড় কাজে লাগিল। উপায় বাহির হইল। প্রমথের নিজের ব্যবহারের জন্য ২টা হীরার আংটী ও একছড়া চেন ছিল; একটা সোনার ঘড়ীও ছিল।

তাহা ছাড়া প্রমথের মার সিন্দুকের ভিতর গহনার বাক্সে অন্যান্য বহুমূল্য অলঙ্কারের সহিত এক ছড়া বড় মতির হার ছিল। যদি কোনো সুযোগে এই কটা দ্রব্য নগদ টাকায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে খুব কম করিয়া হিসাব করিলেও একুনে অনেক টাকা দাঁড়ায়; দুজনের বিলাত যাইবার পথ খরচের উপর অনেক টাকা। তবে আর ভাবনা কি— পথ খুব সহজ। শিক্ষক ছাত্রকে এই কথা বুঝাইল। একটা এতবড় কর্ত্তব্যের খাতিরে খানিকটা সোনা ও গোটাকতক মুক্তার সহিত যদি নীতিজ্ঞানের কতকটা আপাততঃ ছাড়িতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? যেটুকু ত্যাগ করা গেল, তাহা পূরণ করিবার ভবিষ্যত অনেক অবসর আসিবে।

আর দুদিন মাত্র বাকী আছে। আজ দুপুর বেলা বড়বাজারের বাহিরে একটা রাস্তার উপর টমটমে প্রমথ বসিয়া আছে—আর একটা বড় জহুরীর দোকানে নেপাল বসিয়া। হাতে একছড়া মতির মালা। যে দোকানে ছিল তাহার সহিত দামের হিসাব হইতেছে। দোকানী মালা ছড়া লইয়া ফিরাইতেছে, ঘুরাইতেছে—মুক্তা গণিতেছে—কিন্তু দরের ঠিক একটা মীমাংসা হইতেছে না। আশে পাশে আর দুচারজন ছিল। সকলেই মালা আগ্রহের সহিত দেখিতেছে, যথেষ্ট প্রশংসাও করিতেছে। সহসা দোকানী পার্শ্বের এক জনের কাণে কাণে কি বলিল—সে উঠিয়া গেল। দোকানী নেপালকে বুঝাইয়া বলিল, যে মালা কেনা স্থির, তবে যিনি দোকানের মালিক মহাজন তিনি উপস্থিত নাই, তাঁহাকে আনাইবার জন্য লোক পাঠানো হইল।

আধঘন্টার ভিতর একখানা গাড়ী আসিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালীবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দেখিয়া নেপালের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। একবার ভাবিল ছুটিয়া পলাই, কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। যিনি নামিলেন, তিনি নেপালের অন্নদাতা মনিব—প্রমথের পিতামহ।

যে পুর্ব্বে দোকানে বসিয়া নেপালের সহিত কথা কহিতেছিল, সেই দোকানের প্রকৃত মালিক ও প্রমথের পিতামহের বিশেষ অনুগৃহীত। আজ ২ বৎসর পূর্ব্বে সে এই মালা প্রমথের মার জন্য বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা কোট, প্যান্টুলেন, ক্যাপ, বুট আটা ফিরিঙ্গি মূর্ত্তি একটা বাঙ্গালীর হাত দিয়া সেই মালা তাহারই দোকানে বিক্রয়ের জন্য ফিরিয়া আসিবে, ইহার ভিতর একটা মস্ত রহস্য আছে বুঝিতে পারিল। রহস্যটা কি স্থির করিবার জন্য সে ছলনা করিয়া প্রমথের পিতামহের নিকট লোক পাঠায়। সংবাদ পাইবা মাত্র মালার খোঁজ হইল—দেখা গেল মালা অদৃশ্য হইয়াছে। তখনি গাড়ী তৈয়ারী করিয়া বেহারীবাবু দোকানে আসিলেন।

বেহারীবাবু হাসিমুখে নেপালের কাছে আসিয়া বসিলেন। নেপালের সাধ্য নাই যে তাঁহার মুখের দিকে চায়। তিনি হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়! শুনিলাম আপনি এক ছড়া মুক্তার মালা বেচিতে চান। বেশ কথা। আমিও শীঘ্র নাতবৌ ঘরে আনিব ভাবিতেছি। আমার ইচ্ছা একছড়া মুক্তার মালা দিয়া তার মুখ দেখি।"

নেপালের দিবাস্বপ্নের ভিতর এক মুহূর্ত্ত একটু অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। সেই গ্যাসালোকিত বলরুম ভাঙিয়া চুরিয়া দুর্ভেদ্য, উন্নত প্রাচীরবেষ্টিত, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই পিয়ানো, বাস, বেহালার স্থানে কতকগুলো স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড আসিয়া জমিয়াছে।

বেহারীবাবু স্নেহার্দ্রভাবে আবার বলিলেন, "নেপাল বাবু! আমি যখন আপনার হাতের কাছে, তখন কষ্ট করিয়া এতদ্দুর আসিবার আবশ্যক ছিল না। যখন নাতবৌএর মালা দিয়া মুখ দেখিব ইচ্ছা করিয়াছি, তখন কোনো গতিকে মালাছড়া কিনিতে পারিতাম। কৈ দেখি মালা দেখি।"

তখন নেপালের মনে হইতেছিল, নারদের বীণাচ্যুত, ইন্দুমতীর কণ্ঠে পতিত মালার ন্যায় তাহার হাতের সেই মুক্তার মালা আজ একবার সেইরূপ প্রাণনাশিনী শক্তি পায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। কিন্তু তাহা হইল না।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, বেহারীবাবু হাত বাড়াইলেন। মালা সহজেই তাঁহার হাতে আসিল—তখন চিনিতে কি আর বাকী থাকে। তিনি মালা হাতে করিয়াই হাসিয়া উঠিলেন।

নেপাল মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। টেনিসক্যাপটা কপালের উপর আর একটু নামিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার ব্রিমটা কি বেহারীবাবুকে আড়াল করিতে পারিয়াছিল? বেহারীবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বা! দিব্য মালা-আমার জিনিস হইলে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারিতাম, কিন্তু এমন মালা ছাড়িতে পারিলাম না। ওকি মাষ্টার মহাশয়! দুটা কথা ক'ন—চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?"

বড় বাজারের পথ। লোকের চলা ফেরার অভাব নেই। আর যে দোকানে এই কাণ্ড হইতেছিল, সেটাও সমৃদ্ধ দোকান। দেখিতে দেখিতে আরও দু'পাঁচজন লোক আসিয়া জুটিল।

বেহারীবাবু বলিলেন, "নেপালবাবু, কাজটা চটপট সারিয়া ফেলিলে ভাল হয় না! আমার বৈকালে খিদিরপুরে কাজ আছে। কত টাকায় আপনি মালা ছাড়িতে পারেন?"

নেপাল তবু হেঁটমাথা ও নিরুত্তর। দর্শকেরা ভাবিল মজা মন্দ নয়। তখন জনতার ভিতর কেহ বলিল, "ও নেপাল সাহেব! কথা কও", কেহ বলিল "গোপাল! বদন তুলে একবার কথা ক বাপ!" একটা হাসির গোল উঠিল। মজা জমিতে লাগিল।

দোকানদার হাসিয়া বেহারীবাবুকে বলিল, "মশায়! এ মালা আমার দোকান হইতেই বিক্রী হয়-আমি আসল দর জানি। দেখত হে সরকার, ৯২এর চৈত্রের জমা।"

সরকার খাতা দেখিয়া বলিল, "দুহাজার তিনশ বত্রিশ।" দোকানী আবার বলিল, "দেখত জমা কার নামে।"

সরকার। বেহারীবাবুর নামে।

বেহারীবাবু হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সেকি! আমার নামে জমা! তাহা হইলে দুইবৎসর পূর্ব্বে যে মালা আমি একবার কিনিয়াছি–আজ আবার নতুন দাম দিয়া তাহাই কিনিতে হইবে। ও নেপালবাবু, এরা বলে কি?"

নেপাল তখনও হেঁটমাথা–নিরুত্তর।

আঁচে আঁচে অনেকেই মোট কথাটা বুঝিয়া লইল। দর্শকদের ভিতর একজন সুর করিয়া বলিল, "গোপাল রে! গহনার বাক্স কি তোর ননীর হাঁড়ী বলে ভ্রম হয়েছিল?"

এইবার নেপাল মুখ তুলিল। একবার নিতান্ত দীননয়নে বেহারীবাবুর মুখের দিকে চাহিল। বেহারীবাবু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তিনি কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, "এখানে দেখিতেছি গোল মিটিবে না। উঠুন, আপনি গাড়ীতে উঠুন। ঘরে গিয়া দেখা যাবে।"

নেপাল কলের পুতুলের মত গাড়ীতে উঠিল।

মজাটা জমিয়া আসিবার মুখেই শেষ হইল দেখিয়া দর্শকের ভিতর অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইল।

পথে বেশী কথা হইল না। তবে যেটুকু জানিবার, তাহা বেহারীবাবু দুচার কথায় জানিয়া লইলেন।

ঘরে আসিয়া বেহারীবাবু সন্ধান লইলেন অন্য কোন গহনার গরমিল হইতেছে কি না। যখন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন সরকারকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "মাষ্টারের প্রাপ্য বাকী টাকা হিসাব করিয়া চুকাইয়া দাও।"

এত বড় অপরাধের এত সহজে মার্জ্জনা—নেপাল কাঁদিয়া ফেলিল। একবার ভাবিল মুখ ফুটিয়া কিছু বলি, কিন্তু বেহারীবাবু সে অবসর দিলেন না। নেপাল সরকারের সহিত আর দেখা না করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল।

আশ্বিন মাস। পাঁচ ছয় দিন হইল পূজার বোধন বসিয়াছে। নেপাল বাড়ী ফিরিতেছে। হাতে একটা ছোট পুঁটলি।

নেপাল এখন নিঃস্ব। মাষ্টারী চাকুরী যাইবার পর প্রায় দুই মাস বাসায় বসিয়াছিল। কোন নূতন কাজ জুটাইতে পারে নাই। কিন্তু খরচ ঠিক সমান। ঋণও পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। দেনদারেরা প্রথম প্রথম দুচার দিন তাগাদা করিল। শেষে নালিশ করিল। নেপাল আদালতে হাজির হইল না, একতরফায় মকদ্দমা ডিক্রী হইল। কিন্তু নেপালের সঙ্গতি কি, যে টাকা আদায় হইবে। শেষ তাহারা নেপালের সেই অনেক সখের আয়না ওয়ালা দেরাজ, খাট ড্রেসিং টেবিল ক্রোক করিয়া বেচিয়া লইল। আর বেচিল নেপালের ল-বুক। বাসায় যিনি কর্ত্তা, তাঁর কাছেও দুই তিন মাসের টাকা বাকি পড়িয়াছিল। তিনিও নালিশের ভয় দেখাইলেন। দেশের বিষয় ক্রোক করিবার কথা তুলিলেন, শেষ অনেক মিষ্টকথা, হাতে ধরার পর বেশী সুদে লিখিয়া লইয়া আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেন।

যখন স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল, তখন নেপাল বুঝিল, সে সংসারে একজন কপর্দ্দকহীন, ঋণগ্রস্ত দরিদ্র। আর অনেকগুলি ক্ষুধিত মুখ অন্নের আশায় তাহারই দিকে হাঁ করিয়া আছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। মেঘহীন শরৎ-আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। নেপাল মাঠের পথ বহিয়া চলিয়াছে। মাঠের ধানগাছ বড় হইয়াছে—মাথায় শিষ ধরিয়াছে। কোন হইতে চারিদিকে যতদূর যাওয়া যায় বিচ্ছেদহীন সীমাহীন সবুজ–আর মাথার উপর দিশাহারা নীলিমা। কোথায় রাজধানীর সঙ্কীর্ণতা, আবর্জনা, অস্বাস্থ্য, কর্কশতা—আর একি উদারতা কি বৈচিত্র্য, কি শ্যামলোভা, কি মুক্ত স্বাধীনতা! এই ত মানবের প্রকৃত স্বদেশ। কি পরিপূর্ণ জোৎস্না–বুঝি স্পর্শ করা যায়। ধানের শিষ জোৎস্না-ভরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে আর জোৎস্না শিষ বাহিয়া মাঠের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে! ঐ শাঁখের শব্দ শুনা যাইতেছে! ও কোন্ গ্রাম হইতে আসিতেছে—কোন্ গৃহস্থের বাজাইতেছে? ও শব্দ শাঁখেরই ন্যায় শুভ্র, পবিত্র। উহারা হয়ত কত সুখী। ওখানে রাজধানীর হিংসা দ্বেষ, গর্ব্ব দরিদ্রের প্রতি ক্রূর পরিহাস, এসব কিছু নাই। উহাদের ঝরঝরে মাটির দেওয়াল শিশু নিশ্চিন্ত হইয়া দোলনায় ঘুমায়–আর আঙ্গিনার চাঁদের আলোতে বসিয়া গৃহস্থের প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করে, প্রাণ খুলিয়া হাসে; সে গল্প হাসির শেষ হয় না। হায়! যার দেশ নাই, যাদের দেশে মাঠ নাই, যে পূজার সময় দেশে যাইতে পারে না, আর জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া ঐ রাগিণীর আলাপ শুনিতে পায় না, সে সংসারে কি দুর্ভাগা!

নেপাল মাঠ ছাড়াইয়া গ্রামের রাস্তায় উঠিল। আর এক পোয়া পথ যাইলেই বাড়ীতে পৌঁছায়। নেপালের কত দিনের পূজার সময় বাড়ী যাইবার কথা মনে হইল। মনে হইল এমনি দিনে একজন ঐ বাঁকের মুখের বট গাছের তলায়, একটি ছোট লণ্ঠনে আলো জ্বালিয়া তাহার আশায় বসিয়া থাকিত। সে বাড়ীর রাখাল—সৃষ্টিধর। নেপাল বাড়ী যাইবে খবর পাইলে, মা সেদিন সকাল সকাল রাঁধা বাড়া সারিয়া বৈকাল হইতে সৃষ্টিধরকে পাঠাইয়া দিয়া আপনি দরজার কাছে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। মাঠের মাঝখান হইতে সেই ক্ষীণ আলো দেখা যাইত। নেপালের বোধ হইত, যেন সেই অন্ধকার বিজন গ্রাম্যপথে মারই স্নেহময় নিমেষহীন আঁখি তাহার আশায় চাহিয়া রহিয়াছে। তখন কি আনন্দ! কি সুখ! আর আজ—আজ মার কথা স্ত্রীর কথা, পুত্রের কথা মনে পড়ায় নেপালের চোক ফাটিয়া জল পড়িতেছিল। আজ ৪মাস দেখা নাই–খবর নাই। কে জানে কেমন আছে তারা! নেপাল হন্ হন্ করিয়া চলিল।

পাড়াগাঁ–প্রায় সন্ধ্যার পরই সব বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া যায়। নেপালের স্ত্রী সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্বাশুড়ী দেওরদের খাওয়াইয়া, খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া, আপনি খাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় নেপাল বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া চার মাস পরে ভাঙ্গা গলায় ডাকিল–"মা।"

স্ত্রীর আর ভাতে মুখ দেওয়া হইল না। চারিমাসই হউক, আর চারি বৎসর হউক, এ যে

চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ভুল হইবার নয়। বুড়ী ছুটিয়া নেপালের কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কান্না শুনিয়া ছোট ভাইএরা আর বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন একটা হাসিকান্নার ঘটা পড়িয়া গেল।

নেপালের আজ সমস্তদিন খাওয়া হয় নাই। বলিল, "মা, ঘরে ভাত আছে?"

ঘোমটা দিয়া একজন একথাল ভাত রাখিয়া গেল। শ্বাশুড়ী কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। বৌ কানের কাছে চুপি চুপি বলিল, "ঘরে গরম মুড়ী, গুড় আছে, আমার তাই ঢের হবে মা।"

তখন চাঁদের আলোতে, ভাঙ্গা রোয়াকে, ভাঙ্গা পিঁড়ির উপর বসিয়া কলাইএর দাল দিয়া নেপাল ভাত খাইতে লাগিল। পার্শ্বে বা বসিয়া, আর চারদিকে ছোট ছোট ভাইয়েরা তাদের হাসি মুখ লইয়া ঘিরিয়া বসিয়াছে। তাদের আর আমোদ ধরে না—আজ দাদা ঘরে ফিরিয়াছে। নেপালের আনন্দে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতেছিল, গলায় ভাত বাধিয়া যাইতেছিল।

সে রাত্রিতে স্ত্রী পুরুষে অনেক কান্না, অনেক হাসি, অনেক কথা হইল।

সেই আবশ্যক অনাবশ্যক সহস্র কথার ভিতর হইতে নেপালের স্ত্রী শুনিয়া লইল যে নেপালের গলায় এখনও দেনা রহিয়াছে। পড়িবার আইনের বই বিক্রী হইয়া গিয়াছে—অথচ পরীক্ষা দিতে না পারিলে এক বৎসর নষ্ট হইবে। সেটা বড় সহজ কথা নয়।

তার পরদিন নেপাল যখন খাইতে বসিয়াছে, তখন সে কতকগুলো নগদ টাকা ও নোট আনিয়া নেপালের কাছে রাখিল। "তুমি যত শীঘ্র পার দেনা শোধ করিয়া পড়িবার বই কিনিও।"

নেপাল। তুমি এত টাকা পেলে কোথা হ'তে?

স্ত্রী হাসিয়া বলিল, "বিলাত যাইবার জন্য জমাইয়া ছিলাম।"

আসল কথাটা এই। নেপালের শ্বশুর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তিনি নাতির ভাতের জন্য কন্যাকে নগদ দুইশত টাকা পাঠান। আর পূজার সময় বেণারসী কাপড় দিতে স্বীকৃত হন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর ও স্বামীর অবস্থা জানিত। বুঝিয়াছিল, বেণারসী কাপড়ের অপেক্ষা নগদ টাকায় অনেক বেশী কাজ হইবে। সেইজন্য কাপড়ের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা চায়। বাপ আরও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দেন। আজ সেই টাকাগুলি সে স্বামীকে হাসিমুখে বাহির করিয়া দিল।

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নেপাল কথাটা জানাইল। বড় কষ্টে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তখন সাধ্য কি সেই টাকায় হাত দেয়। বলিল, "ও টাকা তুলিয়া রাখ। আমার অদৃষ্টে যা আছে হইবে।"

স্ত্রী। তুমি বাঁচিয়া থাক, খোকা বাঁচিয়া থাক্। টাকার ভাবনাই বা কি, আর ভাতের ভাবনাই বা কি। আপাততঃ মা কালীর প্রসাদ আনিয়া খোকার মুখে দিয়া রাখি। এর

পর হরি দিন দেন ভাতের ঘটা কোরো। তোমার একজামিনের চেয়ে তো আর খোকার ভাত বড় নয়।

ও নেপাল। এ স্ত্রীত বলে নাচতে পারে না। এ যে রাঙ্গা কস্তাপেড়ে কাপড় পরিয়া উনুনে ফুঁ পাড়ে। আর হাঁটু নাচাইয়া ছেলে ঘুম পাড়ায়। আজ ইহাকে কেমন লাগিতেছে?

কালিকানন্দ

—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ-অঞ্চলে বাস করেন। নিষ্ঠাবান্ শাক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি; দুর্গোৎসব এবং কালীপূজা বিশেষ সমারোহে তিনি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সকলেই জানেন, বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ কোনকালে চৈতন্যধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে। এখনও এই মধুর ভাবের নবীভূত অনুরাগোচ্ছ্বাসের দিনে পাশ্চাত্য শিক্ষাগৌরব বিস্মৃত হইয়া বঙ্গীয় ভক্তগণ যখন শচীনন্দনের জন্মভূমি-দর্শনকামনায় ছুটিয়া চলিয়াছেন, নবদ্বীপবাসী কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসলীলার মহোৎসব শান্তিপুরে বিদায় দিয়া নিজেরা তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যামূর্ত্তির আরাধনায় বিভোর হইয়া আছে। শান্তিপুরের রাসরসিক কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের 'পট-পূর্ণিমায়' আদৌ আমল পান না। অতএব নিমাই পণ্ডিত নিজগ্রামে চিরদিন 'গেঁয়ো যোগী' রহিয়া গেলেন। সেখানকার শিষ্টসমাজে অন্তত তাঁহার অবতারত্ব স্বীকৃত নহে। সে কথা শুনিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠে, এখনও এমন লোকের অসম্ভাব নাই।

কালিকানন্দ ভট্টাচার্য্য তাহারই একজন-গোঁড়া শাক্ত যারে বলে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের প্রতি বিদ্বেষটুকু কখন রাখিয়া-ঢাকিয়া প্রকাশ করিতে জানেন না। বৈষ্ণব বাবাজীরা কণ্ঠী পরিয়া শিখা রাখিয়া ঝুলির সহায়তায় হরিনাম করে, অথচ কাছা দেয় না, তাঁহার চক্ষে এমন হাস্যকর ব্যাপার এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। তথাপি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া রক্তচন্দনচর্চ্চিত দেহে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী গায়ে নিজে তিনি 'জগদম্বা' এবং 'দুর্গা দুর্গতিহারিণী'কে ভক্তিগদগদকণ্ঠে যখন ডাকেন, প্রেমাশ্রুতে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যায়।

বৈষ্ণববিদ্বেষ ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের অস্থিমজ্জাগত হইলেও তাহার নিজকুটুম্বেরা সকলেই প্রায় বৈষ্ণববংশীয় এবং কাটোয়া অঞ্চল-বাসী। একমাত্র পুত্র সর্ব্বানন্দকেও বৈষ্ণববংশে বিবাহ দিতে হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাহার হাত ছিল না। সর্ব্বানন্দর যখন ছয় বৎসর মাত্র বয়স, পিতামহ পুরাতন-কুটুম্বগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং তিনমাসের একটি টুকটুকে মেয়েকে প্রাঙ্গণে বিস্তৃত ক্ষুদ্রশয্যায় সূর্য্যকিরণে খেলিতে দেখিয়া তাহাকেই 'নাত-বউ' করিবেন প্রতিশ্রুতি হইয়া আসেন। কাজেই স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় বার বছরের পৌত্রকে ছয়-বৎসরের গৌরীতে পরিণীত করিয়া সুখে গঙ্গালাভ করিতে চাহিলে, পিতৃভক্ত কালিকানন্দ তাহাতে বাধা দিতে পারেন নাই।

সেই বিবাহের পর দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বানন্দ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পাস্ করিয়া বেহারে সরকারী ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার পত্নী যোগমায়া, বছর-দুই হইল, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবাস-গৃহে একটি পুত্ররত্ন তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষে দ্বিরাগমনের পর একবারমাত্র বধূমাতা শ্বশুরের ঘর করিয়াছিলেন, তাহাও মাস-দুয়েকের জন্য। অতএব সর্ব্বানন্দ শ্বশুর-শাশুড়ীর শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার সুযোগ পাইয়া সেই সঙ্গে বধূকে কর্ম্মস্থানে আনাইয়া লওয়ায় সস্ত্রীক কালিকানন্দ বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—বউ ঘর করিল না বলিয়া নবদ্বীপের প্রতিবেশিনীমণ্ডলে দিনকতক খুব হাসি-টিট্‌কারি এবং নিন্দা কুৎসার ধুম পড়িয়া গেল। তাঁহাদের মতে শ্বশুরের বাস্তু-ভিটা-টুকুই গৃহনামের যোগ্য এবং বধূ সেইখানে থাকিয়া ঘর-সংসার করিলেই হইল 'ঘর করা'। স্বামীর সঙ্গে প্রবাসে বাস, সেটা বোধ করি 'বন-করা'—কেন না, জনকনন্দিনী যে কয় বছর বাহিরে বাহিরে ছিলেন, তাহার নাম বনবাস।

বেহাই এবং বেহান যে তীর্থযাত্রার পথে—বিশেষত বৈষ্ণবদের চরমতীর্থ শ্রীবৃন্দাবনের পথে বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে কালে ছেলের উপর রাগ পড়িলেও কালিকানন্দ তাঁহাদের তিনজনের উপর হাড়ে চটিয়া রহিলেন। বছর দেড় পরে পুত্রের এক বন্ধুর পত্রাভাসে পুত্রবধূর সম্ভাবিত সন্তানাবস্থা জানিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "তোমার আমার সেখানে যাওয়া হ'তে পারে না। সেই নেড়ানেড়ীর দল বৃন্দাবন থেকে এসে যা হয় করুক!" কিন্তু মার মন ইহাতে বুঝিবে কেন? সবুর মা ওরফে সর্ব্বানন্দের গর্ভ-ধারিণী অনেক সাধ্যসাধনায় একাই বেহারে যাইবার অনুমতি পাইলেন। সঙ্গে গেল বামা চাকরাণী—সে ইতিপূর্ব্বে আর কখন গ্রামের বাহির হয় নাই। গুণের মধ্যে প্রধান গুণ গ্রাম্য বক্তৃতামঞ্চে-যথা, মেয়েদের স্নানের ঘাটে–এবং পাড়ায় কোঁদল বাধিলে তাহার জোড়া নাই। গ্রামের সুরসিক কাব্যচঞ্চু-মহাশয় একদিন বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বামা-সুন্দরি, নামটি তোমার যাহা, তাহাতে অমন রুদ্ররস ত শোভা পায় না! বামা কিনা অবলা!" শুনিয়া বামাকৈবর্ত্তানী ওরফে বামাসুন্দরী দাসী মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু অসুর-সম্রাজ্ঞীর মতনই ভ্রুভঙ্গী করিয়া তাহাকে যাহা শুনাইয়া দিয়াছিল, অন্বয় করিয়া বুঝিলেন তাহার মানে দাঁড়ায়–"বামা আমি না তুমি?"

কালিকানন্দ বামার কদর বুঝিতেন। এই বামাদাসী এবং পুত্রের প্রেরিত বাঙালী কম্পাউণ্ডার সঙ্গে তিনি গৃহিণীকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার মাস-দুই পরে সবুর মা পৌত্রমুখ সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার আহ্লাদ রাখিবার ঠাঁই রহিল না। বহূজীর প্রসববেদনা আরম্ভ হইতে না হইতে হিন্দুস্থানী দাইয়েরা 'সোহর' গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহার ভিতর বৃন্দাবন, নন্দরাণী ও নন্দলালা ছাড়া আর কোন কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বড় হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। মহা ব্যস্ততা ও উদ্বেগের মধ্যে মাঝে-মাঝে কর্ত্তাটিকে মনে পড়িতেছিল এবং এই সময়ে বৃন্দাবনের গান শুনিলে তিনি কেমন গালে-মুখে চড়াইতেন, সে দৃশ্যও তদীয় মানসচক্ষুকে এড়াইতে পারিতে-

ছিল না। বামাসুন্দরী দাইদের পুরুষোচিত ধরণে বস্ত্রপরিধান দেখিয়া প্রথম-প্রথম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং দুই চারিদিনের ভিতর তাহাদের নামকরণ করিয়াছিল–'মেয়ে–মরদী'। তাহাদের কাঁইমাই গান শুনিয়া আজ তাহার ভারি হাসি পাইতেছিল, কিন্তু বউমার মুখ চাহিয়া সে তাহা সংবরণ করিল। খোকা ভূমিষ্ঠ হইলে সেই সংবৃত হাস্যলহরীর উৎস সে খুলিয়া দিল, এবং কর্ত্তামার নূতন একটি বর জুটিল বলিয়া শতবার তাঁহাকে অভিনন্দন করিল।

সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া মা বলিলেন, "সবু, তাঁকে এখুনি চিঠি লেখ বাবা! আমার জবানি লেখ যে এ আমার টাকার সুদ,–বড় মিষ্টি! তিনি যেন শীগ্‌গিরি একবার আসেন।" সবু লজ্জিত হইয়া কহিল, "আর কাউকে দিয়ে লেখাও মা, আমি পারবো না।" পুত্রের সে লজ্জানম্র মুখ দেখিয়া মাতার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূরিয়া উঠিল।

কিন্তু কর্ত্তা আসিলেন না। গৃহিণীর চিঠিতে বারংবার বেহারে আসার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার উপর পর্য্যন্ত চটিয়া গেলেন। এদিকে সর্ব্বানন্দ-নন্দন বামাদাসীর বিবিধ প্রকারের মুখভঙ্গী এবং সোহাগ আদরে হাসিয়া হাসিয়া পিতামহীর ক্রোড়ে শশিকলার মত বাড়িতে বাড়িতে ছয় মাসের হইল। তখন সর্ব্বানন্দ মাতার অনুরোধে ছুটির দরখাস্ত করিল, দেশে গিয়া ছেলের অন্নপ্রাশন হইবে। গৃহযাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে, এমন সময়ে খবর আসিল, ছুটি মঞ্জুর হয় নাই। ইহাতে গোসার মুখে সর্ব্বানন্দ চাকরী ছাড়িয়া দেশে গিয়া ডাক্তারী করিয়া খাইবে, অনুপস্থিত সরকার-বাহাদুরকে দুই চারিবার এরূপ শাসাইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে আবার ছুটি চাহিলেই পাইবে ভরসা করিয়া দুইচারদিনে জল হইয়া গেল। খোকা প্রবাসে ভাত খাওয়ায় ঠাকুরমা আদর করিয়া নাম দিলেন–"ছাতুখোর!" বামা নাম রাখিল, "মেড়ুয়াবাদী!"

পৌত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে সমারোহ করিবার অভিপ্রায়ে কালিকানন্দ যে-কিছু উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সর্ব্বানন্দের বিদায়বিভ্রাটে তাহার সকলই পণ্ড হইয়া গেল। ইহাতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ভ্রমেও সন্দেহ করিলেন না যে, ছুটির এই গোলযোগ পুত্র এবং পুত্রবধূর ইচ্ছাকৃত,–একটা বাহনমাত্র। ইহাতে কিন্তু প্রতিবেশী বিশেষত প্রতিবেশিনীদের মন উঠিল না। যোগমায়া এই উপলক্ষে আর একবার তাঁহাদের সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় পড়িলেন। জ্ঞাতিকন্যা হাবুর মা কিছু উৎসাহিত হইয়া কালিকানন্দের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন, "আর শুনেচো দাদা, গাঁয়ে ছিছি হ'য়ে গেল যে!"

কালিকানন্দ কিছু মিতভাষী, বিস্ময় বা অদ্ভুত রসের ধার বড় ধারেন না। স্মিতমুখে ধীরে উত্তর দিলেন, "কি ভগিনি?"

ইহাতে বাবুর মা ওরফে দিগম্বরী ঠাকুরাণীর করুণরস উছলিয়া উঠিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কিছু বেগের সহিত তিনি বলিলেন, "আহা দাদা, তোমার দুঃখু দেখে আমার বড় দুঃখু হয়। ছেলে-বউ তারা তো গেরাহ্যই করে না, বউও কিনা পর হয়ে গেল!" এটা ঠিক করুণরস কি হাস্যরস, বুঝিয়া উঠিতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের একটু দেরি হইল। সহজেই

তাঁহার মনে পড়িল, বিধবা ভাগিনেয়টি পীড়িত হইলে স্বহস্তে তাঁহাকে পাক করিয়া খাইতে হইয়াছিল, জ্ঞাতি-ভাই-ভগিনীরা তখন ডাকিয়া সুধান নাই। অতএব কিছু কৌতূহলী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপারখানা কি? উত্তরে শুনিলেন যে, পূজা সম্মুখে, বলিদান দেখার ভয়ে সবুর বউ নাকি ছল করিয়া বাড়ী আসিল না। ইহার পর কথাটা নানাসূত্রে অনেকবার কর্ণগোচর হইল। নেড়ানেড়ীর বংশে সকলই সম্ভব, ধ্রুব জানিয়া কালিকানন্দ পুত্রকে চিঠি লিখিলেন যে, "শ্যামাপূজার পর আমি সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে বাহির হইব স্থির করিয়াছি, যত সত্বর হইতে পারে, তোমর গর্ভধারিণীকে বাড়ী পাঠাইবে। বধূমাতাদের এখন পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় পৌত্রকে সহস্রবার চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে কর্ত্রী ঠাকুরাণী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। দেশের কলাই-দাল এবং বড়ির টক মনে পড়ায় বামাদাসীরও আর মন টিকিল না। তবে যোগমায়ার মত লক্ষ্মী বউটিকে, বিশেষত খোকাবাবুকে ছাড়িয়া যাইতে তাহারও প্রথম-প্রথম মন কেমন করিয়াছিল।

গৃহিণীর মুখে পুত্রবধূর অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিয়া ভটাচায্য বুঝিতে পারিলেন যে, নেড়া-নেড়ীর পুত্রকন্যারা তবে যাদুকরী বিদ্যাও জানে! কিন্তু নখনাড়ার ভয়ে মনের সন্দেহ স্পষ্টীকৃত করিতে পারিতেন না। নাতি দেখিতে ঠিক তাঁহারই মত হইয়াছে শুনিয়া ভারি খুসী হইলেন; স্থির করিলেন, মাতামহগৃহে কখন তাহাকে যাইতে দিবেন না।

বামাসুন্দরী প্রায় দশমাস বেহার-অঞ্চলে বাস করিয়া অভ্যস্ত গালিগুলির পুঁজি বাড়াইয়া আনিয়াছিল, সে যেন কতকটা অস্ত্রে শাণ দেওয়ার মত। পাড়ার শতেক-খুয়ারীরা নিরীহ বউমার নিন্দা রটাইয়াছে শুনিয়া, 'দুরন্ত জবানে' উদ্দেশ্যে সে হিন্দী 'গারি'গুলির যেরূপ সংস্কার ও সদ্ব্যবহার করিয়াছিল তাহার পরিচয়ে আর কাজ নেই।

এই সকল ঘটনার প্রায় দেড়বৎসর পরে সর্ব্বানন্দ ছুটি লইয়া বাটি আসিল। তখন পূজা আগতপ্রায়, শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে এবং হিল্লোলিত ধান্যক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতেছিল। পরিপূর্ণা ভাগীরথীর অপেক্ষাকৃত নির্জন ঘাটে সর্ব্বানন্দের নৌকা আসিয়াছে। তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর। স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া, খড়ম পায়ে, নামাবলী গায়, স্বয়ং কালিকানন্দ সেখানে বিচরণ করিতেছিল। রক্তচন্দনচর্চিত ললাটতল কুঞ্চিত করিয়া যে ভাবে তখন তিনি সুদীর্ঘ এবং সুপক্ক গুম্ফাগ্রভাগ দক্ষিণ করে লাঞ্ছিত করিতেছিলেন, তাহাতে সেই পুরাকালের ভীম মূর্ত্তি কাপালিকের সাদৃশ্য কতকটা অনুভূত হইতেছিল। দেখিয়া সরলা যোগমায়া অপরাধিনীর মত ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। সর্ব্বানন্দ সসম্ভ্রমে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃপদ বন্দনা করিল।

খোকাবাবু হাঁটিতে শিখিয়াছেন এবং কথাবার্ত্তাও বিস্তর বলেন, কিন্তু তার পনর-আনা তিন-পাই হিন্দি। বামাদাসীর কোলে চড়িয়া পিতামহের সমীপবর্ত্তী হইয়াই বলিলেন— "সেলাম মহারাজ!" তিনি ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহুপ্রসারণ করিলো, তাঁহার দীর্ঘ গুম্ফ দুই কচি-কচি হাতে অধিকৃত করিয়া সুধাইল—"তুম কোন্ হ্যায় হো!"

চব্বিশ ঘন্টার ভিতর এই ছাতুখোর শিশুটি ঠাকুরদাদার সঙ্গে দিব্য সখ্যসংস্থাপন করিল। পিতামহদত্ত অভয়ানন্দ নাম অব্যবহারে পোষাকী কাপড়ের মত এতদিন তোলা ছিল, অতএব প্রথম-প্রথম তাহাতে অভিহিত হইলে খোকা রাগিয়া বলিত–"হামকো গারি দেতা হ্যায় ?" মার কাছে ছুটিয়া গিয়া দুইচারিবার নালিশও সেজন্য করিয়াছিল। কালিকানন্দ পৌত্রের সর্ব্বকার্য্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন, মুগ্ধের ন্যায় অহোরাত্র তাহার অনুসরণ করেন। পূজা-আহ্নিকের সময় অভয়ার চরণকমল ভাবিতে ভাবিতে অভয়ানন্দকে তাঁর মনে পড়িয়া যায়। তারপর পূজাশেষে তাহার বিমল ললাটতল ফোঁটা কাটিয়া দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরেন। এবং গদগদকণ্ঠে ডাকেন–"দুর্গে, দুর্গে, একি মায়ায় ফেলিলে!"

যোগমায়া কৈশোরে শ্বশুরকে দেখিয়াছিল, বৈষ্ণবদ্বেষী গোঁড়াশাক্ত বলিয়া পিতৃগৃহে তাঁহার যে নাম ছিল, তাহাতেই সে বরাবর ভয় পাইত। কিন্তু ছেলে অভয়ানন্দ তাহার সে ভয় ভাঙ্গাইয়া দিল! ঠাকুরদাদার ক্রোড়ে অন্যমনস্কভাবে খেলিতে খেলিতে যখন-তখন বলিয়া উঠিত, "মা যাব" এবং এইরূপে দিনে দশ-বার-বার সে তাঁহাকে মাতার সান্নিধ্যে লইয়া যাইত। শেষে কালিকানন্দ ঝগড়া করিতেন, "তোর মা না আমার মা।" তখন সেই বৃদ্ধ ভাইতে ও শিশু ভাইতে মা লইয়া ঝুটোপাটি বাধিয়া যাইত।

বাস্তবিক কালিকানন্দ দেখিলেন গৃহিণীর কথা সত্য, লক্ষ্মী বউটি তাঁর। গৃহকর্ম্মে তার বিরাম বিশ্রাম নাই, অথচ মুখে কথাটি নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় তাহার যেমন আনন্দ, তেমনই তন্ময়তা, বিরূপ প্রতিবেশিনীদের পর্য্যন্ত তাহার আচরণের সমালোচনায় সুর বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। স্নেহে শ্বশুর বলিলেন, "বউমা, আমার ত মেয়ে নাই, তোমায় পেয়ে সে অভাব আমার দূর হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা কহিয়ো মা, "লজ্জা করিলে চলিবে না।" ছেলে পিতামহের অনুকরণ করিয়া আধো আধো স্বরে বলিত, "কথা কও মা, কথা কও।" শাশুড়ী শুনিয়া হাসিতেন, আর বলিতেন, "সত্যিই ত বউমা, আমাদের আর কে আছে?" কিন্তু যোগমায়া শ্বশুরের কাছে মুখ ফুটিতে পারিত না, তবে ক্রমে দীর্ঘ ঘোমটাকে সংযত করিয়া আনিল বটে।

শ্বশুর পুত্রবধূর মধুর প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবীর বেটীটি যে শাক্তদ্বেষিণী, এ সন্দেহ কিছুতে তাঁর দূর হয় না। যখন-তখন গৃহিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলেন– "বৈষ্ণবীর বেটি আজ পর্য্যন্ত বাড়ীর পূজো কখন দেখেন নি, এবার সে দুঃখ আমার ঘুচবে।" সবুর মা অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করেন, "কিন্তু বউমা আমার বড় মায়াবী আর ভীতু, বলিদান দেখ্‌তে পারবে না!" ইহাতে কালিকানন্দ উষ্ণ হইয়া উঠেন।–"তোমার যেমন কথা, শাক্ত-ঘরের বউ, বলিদান না দেখলে শুদ্ধ হয় না।"

নবমীপূজার দিন মধ্যাহ্নে ভট্টাচার্য্য-গৃহে বড় ধুম—ঢাক-ঢোলের বাদ্যে কাণ পাতা যায় না। বলিদান-সুরু হইতে আর বড় দেরি নাই, মহিষশাবকটা স্নান হইয়া যূপকাষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে, অনূন্য ২৫।৩০ ছাগ আর্দ্রদেহে কাঁপিতেছে, তাহাদের গলার দড়িধারীরা কোমরে

গামছা জড়াইয়া উৎফুল্ল-মুখে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে। কর্ম্মকার তীক্ষ্ণ অসি উদ্যত করিয়া দুর্গানাম জপিতেছিল, মহিষ এবং ছাগের দল দুর্গা দুর্গতিহারিণীকে ডাকিতে-ছিল কি না, বলিতে পারি না।

কালিকানন্দ পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চণ্ডীমণ্ডপসম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিদান সুরু হইয়া গেল। সহসা অন্দরপথে আর্ত্তকণ্ঠের করুণ চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপতল করিয়া "জয় জগদম্বে" রব তখন আকাশে উঠিতেছিল, সে রোদন এক সর্ব্বানন্দ ছাড়া আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। মাতা ডাকিয়া পাঠাইতে না পাঠাইতে সর্ব্বানন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল—দেখিল, তাহার অনুমান সত্য, পশুশোণিতপাতের সে বিকট দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া যোগমায়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে। মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে-চোখে জলসেচন করিতেছেন।

বলিদান শেষ হইতে না হইতে খোকাও বড় ভয় পাইয়া গেল। "মা যাব" বলিয়া সে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, কালিকানন্দ সেখানে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

যোগমায়ার মূর্চ্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু আতঙ্কে তাহার জ্বরবিকার হইল। মাতার অসুখে অভয়ানন্দ রাত্রিদিন কাঁদিতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে শোণিতস্নাত উদ্যতখড়্গধারী ঘাতকের মূর্ত্তি মনে করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিত। বিকারাবস্থায় যোগমায়া প্রায় বলিত,

"মাগো, এ যে রক্তের নদী, কি ক'রে পার হব!"

লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূর রুগ্নশয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া কালিকানন্দ মনঃস্থির করিলেন, ভবিষ্যতে বলিদান উঠাইয়া দিবেন। যোগমায়া ভাগ্যে-ভাগ্যে সারিয়া উঠিল। কালিকা-নন্দের গৃহে সেই হইতে বলি উঠিয়া গিয়াছে—বলিদান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল ইক্ষু, লাউ ও কুমড়ার।

বঙ্গদর্শন—১৩০৮

বঙ্গনারী

—ক্ষেত্রনাথ গুপ্ত

এই ঘটনা কাশী হইতে প্রত্যাগত একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের মুখে শ্রুত। তিনি ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে স্থানে এই ঘটনা বিবৃত হয় সেই স্থানে উপস্থিত একজন ডাক্তারও ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

খড়িয়া নদীর অদূরবর্ত্তী কোন গণ্ডগ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ সে অঞ্চলের একমাত্র বর্দ্ধিষ্ণু লোক। গ্রামটি ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অধিকার ভুক্ত। ব্রাহ্মণের সাত পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটি সকলের ছোট। ব্রাহ্মণ অনেক অনুসন্ধানে একটি সুপাত্র আনিয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। যুবাটি শান্ত প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান; বিবাহের পরই পরিবার পালনের উপযোগী অর্থ সঞ্চয়-মানসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন।

এক দুই করিয়া ক্রমে ছয় সাত বৎসর অতীত হইল; জামাতার কোন সন্ধান নাই। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে সেটা বড় ভাবনার বিষয় নয়। ব্রাহ্মণের পুত্রগণও বিবাহ করিয়াছে কেহ দুটি কেহ বা দশটি; কিন্তু কেহই কখন পত্নীর সন্ধান গ্রহণ করেন নাই।

জামাতার কথা ভাবে এক জন।—বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কন্যার মুখ চাহিয়া আছেন, কেবল তাঁহারই কষ্ট হয়। কেবল তিনিই ভাবেন জামাতা কি আমার কন্যাকে লইয়া সংসার করিবে না? আর ভাবে কন্যা!—শুভদৃষ্টির সময় একবারমাত্র কন্যা পতির বদন দর্শন করিয়াছে। আহা আর কি কখন তাহার ভাগ্যে সে শুভ দিন ঘটিবে?

এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল।

আশ্বিন মাস। পূজার আর অল্প দিন বাকী আছে। সন্ধ্যাকাল। খড়িয়া নদীর তীরবর্ত্তী অত্যুচ্চ তিন্তিড়ী বৃক্ষের শিরোভাগে অতি অল্প সূর্য্যকিরণ দেখা যাইতেছে। এমন সময় একখানি নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

সর্দ্দার মাঝি বলিল "ঠাকুর মশাই এই ঘাট।" ছইএর ভিতর হইতে একটি যুবা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাম! তুই না বলিছিলি তোর বাড়ী এই গ্রামে?"

মাঝি। "হ্যাঁ! ঐ যে ঘাটের ওপরই আমার বাড়ী।"

যুবা। তা বেশ হয়েছে, আমি কাল পরশু এখান থেকে ফিরবো, তোর নৌকাতেই যাব। তুই আমার জিনিষপত্রগুলো তোর বাড়ীতে নিয়ে রেখে দে। আর আমি—গ্রামে যাব কোন্ পথ দিয়ে বল দেখি?

মাঝি। এই দেখ ঠাকুর মশাই, সে গাঁয়ে যাবার দুটো পথ আছে, এই সদর রাস্তা ধরে যদি যাও, তা হলে আধ কোশটাক হবে, কিন্তু এই মাঠের পথে গেলে পোয়াটাকের বেশী হবে না। কিন্তু সন্ধেকালে মাঠ দিয়ে আপনি যেতে পারবে না। রাস্তা ধরেই যাও।

যুবা। চোবে! হাতবাক্স লেকে মেরা সাথ্ আও।

একজন হৃষ্ট পুষ্ট দ্বারবান একগাছ লাঠি ও একটা বাক্স লইয়া ছইএর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অনন্তর উভয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিল।

যুবা দৃষ্টি পথের অতীত হইতে না হইতেই আর এক মাঝি রামাকে বলিল "রামা, বাক্সটা মেরে নি।"

রামা। কিছু দরকার নেই। যখন গ্রামের মধ্যে গেছে তখন সব এক গর্ত্তেই যাবে। আমরা যা পেয়েছি এই গুলো নে যাই। এতে ঢের হবে।

এই বলিয়া নৌকাস্থিত আর আর দ্রব্য লইয়া তাহারা মাঠের পথে গ্রামাভিমুখে চলিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। গ্রামের লোকে কেহ প্রদীপ জ্বালিয়াছে, কেহ জ্বালিতেছে। গ্রামের সকল গৃহই মাটির। একটি বাটির বহির্ভাগে চণ্ডীমণ্ডপের উপর সাতজন লোক একটা মাদুরের উপর বসিয়া আছে। এমন সময় মাঝিরা দ্রব্যাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

চণ্ডীমণ্ডপে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"কেরে, রামা নাকি?"

রামা। আজ্ঞে হাঁ গো!

এই বলিয়া জিনিষ পত্র সমস্ত নামাইল। পূর্ব্ব কথিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল— "হ্যাঁরে রামা তুই এত কাল কোথা ছিলি, ব্যাটা।"

রামা। বড়মশাই! এত কাল আমি কাশী অঞ্চলে ছিলাম। বড় মাল নিয়ে এসেছি।

বড়। এই গাল্‌চে, হুকো, বৈঠক ঘটি বাটি থালা, লেপ বালিস, এই বুঝি তোর বড় মাল?

রামা। ভাল করে দেখো না কর্ত্তা, গালচে টাল্‌চে গুলো কত দামী। ও গুলো কি অমনি হয়েছে, কাশী পর্য্যন্ত ঘুরে তবে জোটান গেচে। যাক এখন আমাদের কি দেবে দাও, খাওয়া দাওয়া করিগে। সকাল শুদ্ধ খাওয়া দাওয়া নেই।

বড়। আজ যা, কাল ভাল করে জিনিষ গুলো দেখে দর বুঝে যা তোর প্রাপ্য হয় তোকে দেওয়া যাবে।

রামা। যে আজ্ঞা। সেই ভাল।

এই বলিয়া মাঝিরা চলিয়া গেল। আর সকলে লুণ্ঠিত দ্রব্য সমস্ত দেখিতে লাগিল।

গালিচা খানা পাতিয়া সকলে তাহার কাজ দেখিতেছে; এমন সময় দুইজন লোক বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া একজন বলিল। "কে ও?"

"হরিনাথ শর্ম্মা, উপাধি মুখোপাধ্যায়।"

নাম শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিল "আরে কেও মুখুর্য্যে অনেক দিনের পর কোথা থেকে, এস এস বস।"

নবলুণ্ঠিত গালিচা পাতা। জামাই বাবু তাহার উপরেই বসিলেন। সম্মুখে বৈঠকের উপর রূপাবাঁধা হুঁকা, পার্শ্বে আরও কত কি! কিন্তু জিনিসগুলি দেখিয়া জামাই বাবুর অন্তরে যে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নয়!

বলা বাহুল্য যে উপস্থিত ব্যক্তি দুইজন রামার নৌকার যুবা আরোহী ও তাঁহার ভৃত্য চৌবে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "মুখুর্য্যে মশাই, এত দিন কোথায় ছিলে, একবারও কি সংবাদ দিতে নাই?

যুবা। ভাই এতদিন এ দেশে ছিলাম না, পঞ্জাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় গিয়েছিলাম। এখন কিছু সঞ্চয় করে বাড়ী যাচ্ছি। মনে করেছি, একেবারে পরিবারকে নিয়ে যাব।

তা বেশ ত! এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি আছে। তা পশ্চিমে গিয়ে ছিলে, কি দেখ্‌লে শুন্‌লে?"

"দেখ্‌ব শুন্‌বো আর কি ভাই! দেখ্‌তে শুন্‌তে ত যাইনি। তবে আসবার সময় ভাবলেম, আর ত এদিকে আসা ঘটবে না। তাই, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ হয়ে, কাশীতে এসে দিন কত ছিলাম, তার পরে তোমাদের দেশের এক খান নৌকো করেই বরাবর আসচি?"

সকলে শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ বলিল—"আমাদের দেশের নৌকায়? কার নৌকায়?"

"রামা মাঝির! আমার জিনিষ পত্র সব তার বাড়ীতে রেখে অনেক কষ্টে এ বাটী চিনে এসেছি।"

সকলে কিছু যেন চাপিয়া বলিল "তবে হইবে, এপথে ত কখন এসো নাই, চিন্‌বে কি করে।" এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ তিন জন সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

যুবা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ব্যাপার কি? এত দেখ্‌ছি সকলি আমার জিনিষ, এখানে এলো কেমন করে? এরা কি ডাকাত, আমি চলে এলে আমার নৌকোয় ডাকাতি করে সব এনেছে? তাই কি রামা মাঝির নৌকায় এসেছি শুনে পরামর্শ কর্‌তে গেল? আমায় কি খুন কর্‌বে? যত এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, ততই যেন প্রাণ ওষ্ঠাগ্রে আসিতে লাগিল।

এদিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিয়াছে। জননী আনন্দিত চিত্তে কতই আশার মূর্ত্তি গড়িতেছেন। কন্যারও অন্তরে আনন্দপ্রবাহ ছুটিতেছে। বহুদিন পরে স্বামীর শুভ

আগমন সংবাদ শুনিলে পতিপ্রাণার প্রাণে কত আনন্দ, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর সাধ্য নয়।

মাতা রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তা, কন্যা পশ্চাতে উদ্যোগ করিয়া দিতেছেন। মাতা রন্ধন করিতে করিতে কতই আশার কথা বলিতেছেন, জামাতা আসিয়াছে, কন্যাকে লইয়া যাইবে, তাহাকে লইয়া সংসার করিবে। এ সকল কথা কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে কন্যাকে নানা উপদেশও দিতেছেন।

এমন সময় তাঁহার পুত্র সকলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই এক বাক্যে বলিল "মা!"

সে শব্দে যেন কি একটি বৈদ্যুতিক স্রোত আছে। শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণীর প্রাণে কি ভাবের উদয় হইল, প্রাণ যেন কাঁপিল, কি যেন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত।

মাতা। কেন্ রে?

জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড় বিপদ উপস্থিত।

হৃদয়ের সন্দেহ নিরাকৃত হইল। প্রাণ আরও কাঁপিল। বলিলেন "কি বিপদ্ বাবা!"

পুত্র। "সর্ব্বনাশ হয়েছে! আজ মুখুর্য্যের নৌকো লুট করে নিয়ে এসেছে! মুখুর্য্যে তা বুঝ্তে পেরেছে।"

মাতা। তা আর কি হবে সে ত পর নয়, বুঝিয়ে বলগে, আর তার জিনিষ ফিরিয়ে দাওগে, তা হলেই হবে।"

পুত্র। তা কি হয় মা! তা হলে কি আমরা ডাকাতি করি একথা ছাপা থাক্‌বে?

এবার মাতা কন্যা উভয়েরই প্রাণ কাঁপিল। ভগিনী যে অন্ধকারে বসিয়া আছে, তাহা দুর্বৃত্তেরা জানিতে পারে নাই। মাতা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তবে কি হবে।"

পুত্র। একেবারে সাবাড়! বাবারও তাই মত!

মাতা শুনিলেন, শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। বক্ষ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বলিলেন—"ওরে সর্ব্বনেশে কি বল্লি? সুশীলার মুখ চেয়ে একবার ভেবে দেখ্ দেখি, তার দশা কি হবে। সে ত আমার পর নয় সেও ছেলে।"

পুত্র। যথার্থ কথা, সেও ছেলে, আমরাও ছেলে—তাকি আমি জানিনে? কিন্তু একটি ছেলে রাখতে গেলে যে আর সাতটি ছেলে যায়? তার প্রাণ বড় কি আমাদের প্রাণ বড়? পুলিসে আমাদের দেশের ডাকাতি ধরবে বলে কত চেষ্টা কর্‌চে, কত সাহেব কত ফৌজ নিয়ে থানায় রয়েছে। কেবল, কখন ডাকাতি হয়, কোথায় ডাকাতি হয়, কে ডাকাতি করে, কিছুই জান্‌তে পারে না বলেই ত কিছু করে উঠ্‌তে পারে না। মুখুর্য্যে বাঁচলেই আমাদের সর্ব্বনাশ। জান না কি ট্যাটরা দেছে, যে লোক ডাকাতের খবর দিতে পার্‌বে এক হাজার টাকা বকসিস্ পাবে। টাকার লোভ কি সহজ?

মাতা হতবুদ্ধি।

বালিকা সুশীলা ভাবিতেছে "হায় কোন রকমে কি পতির প্রাণ রক্ষা হয় না?" ক্ষণেক পরে মাতা বলিলেন। "যা বলছো তা যথার্থ বটে, কিন্তু সুশীলার দশা কি হবে?"

পুত্র। কেন তার কি? এইত এত কাল মুখুর্য্যে এখানে ছিল না, তার কি ক্ষতি হয়েছিল? কুলীন বামুনের মেয়ের স্বামী থাকাও যা, না থাকাও তা। এইত আমরা কত জায়গায় কত বিয়ে করে এসেছি তাদের কি দিন কাট্‌বে না?

তাদের দিন কাটছে সত্য! কিন্তু সুখে কি দুঃখে তা তারাই জানে। গৃহ নিস্তব্ধ, সুশীলা দেখিলেন, পতির প্রাণ রক্ষা হওয়া সুকঠিন। মাতার মত না হইলেও ভ্রাতারা তাহাকে হত্যা করিবেই! তিনি কি ভাবিলেন। বলিলেন "দাদা!"

শব্দ শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল, গৃহ মধ্যে বজ্রপাত হইলেও কেহ অধিক চমকিত হইতে পারিত না।

সুশীলা মৃদু ধীর বচনে বলিতে লাগিলেন "দাদা! তোমরা যা বল্‌চো তাই ঠিক! এই যে এত কাল যে এখানে ছিল না, আমি কি মরে গিয়েছি! কিন্তু দাদা তবু একবার খানিক তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

ভ্রাতা। "আহা তা আর হবে না! তা বোন্! আমি তাকে এখনি বাড়ীর ভেতর ডেকে আন্‌ছি। আজ সমস্ত রাত্রি তার কোন অনিষ্ট কর্‌ব না। তাকে কিছু বল্‌তেম না। কিন্তু বুঝ্‌তেই ত পার্‌চো, তা নইলে আমাদের প্রাণ যায়।"

ভগিনী। তাকি আমি জানিনি?

জ্যেষ্ঠ। দেখ্‌লি মা! সুশীলা কি আমাদের তেমন বোন?

এই বলিয়া দুর্বৃত্তগণ চলিয়া গেল। মাতার আর রন্ধনে মন নাই। সুশীলা নিজে একখানি থালায় ভাত বাড়িয়া এবং যা কিছু ব্যঞ্জন রন্ধন হইয়াছিল লইয়া নিজ শয়নকক্ষে প্রস্থান করিলেন, আজ সুশীলার লজ্জা কিছু কম। অবলা বালার হৃদয়ে আজ ঐশী বলের আবির্ভাব হইয়াছে।

তবে বালিকার আর এক বল আছে,—ধর্ম্ম। দুর্ব্বলের চির দিনের সম্বল ধর্ম্ম! কিন্তু সকলেই ত বলে পাপের কাছে ধর্ম্মের বল কার্য্যকর নয়। সকলেই ত বলে পাপী অভ্যুদয় লাভ করে, ধার্ম্মিক চিরদিন দুঃখে কাল যাপন করে। কিন্তু এ জগতের সুখ দুঃখ যে কি, তা সকলে জানে না, তাই ও কথা বলে। যে যথার্থই ধর্ম্মকে সম্বল করিয়াছে তাহার পার্থিব সুখ নাই, দুঃখও নাই—পার্থিব জয় নাই, পরাজয়ও নাই—কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে ধর্ম্ম সহায়ে নিশ্চয়ই সকল মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে থাকিয়া নিরন্তর এই কথা তার প্রাণের কানে বলিতে-ছেন। সেই কথা শুনিয়াই আজ বালিকার এত সাহস।

পতিপ্রাণা সুশীলা বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় হরিনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা স্বামীকে দেখিবা মাত্রই অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিলেন। হরিনাথ একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া খট্টার উপর বসিলেন। পদদ্বয় ভূমিতেই সংলগ্ন রহিল।

অন্য সময় হইলে হরিনাথ হয় ত পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কত কথা বলিতেন, কিন্তু আজ তাঁর প্রাণ মন সবই নানা স্থানীয়, ভয়ে প্রাণ যে কোথায় তাহার সন্ধান নাই। মন সকল বিষয় ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছে তাহা তাঁহার মন তিনি জানেন কি না সন্দেহ। কেবল শূন্য দৃষ্টি পত্নীর পানে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও সজল।

সুশীলা অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে স্বামীর ভাব স্পষ্ট বুঝিলেন। বুঝিলেন স্বামী উপস্থিত বিপদ্ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। দেখিলেন এসময় লজ্জা করিয়া থাকিলে চলিবে না। বলিলেন—অতি মৃদুস্বরেই বলিলেন "তুমি খাও।"

হরিনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চ রোদন নয়। যে নেত্র এতক্ষণ সজল ছিল, সে জল সে আর ধারণ করিতে পারিল না। চক্ষের জল দর দর ধারে গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল; কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না।

সুশীলা বলিলেন "কাঁদ কেন?"

হরিনাথ বলিলেন "কাঁদি যে কেন, তা আমি এখনও জানিনে। কিন্তু সত্য বল, আমাকে কি এরা মেরে ফেল্‌বে?"

এবার সুশীলাও কাঁদিলেন, কিন্তু ইহাও স্ত্রীলোকের উচ্চ রোদন নয়। কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকটে আসিলেন। স্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন "ভয় নাই! তুমি আহার কর! যদি এত কাল কেবল ঐ চরণই ভেবে থাকি, তা হলে কখনই চরণসেবায় বঞ্চিত হব না। জগজ্জননী আমার প্রাণে এমন আঘাত কখনই দেবেন না।"

হরিনাথ। কিন্তু তুমি বালিকা! এ শত্রুপুরী! তুমি কি করবে?

সুশীলা। আমি আর কি করবো? আমার কি সাধ্য? কেবল একবার বিপদ-নাশিনী দুর্গার নাম করে চেষ্টা করে দেখ্‌বো। দেখ্‌বো তিনি আমার ভাগ্যে কি করেন।

হরিনাথ। কি কর্‌বে আমায় বল।

সুশীলা। বল্‌বার ত আর সময় নেই। রাত যে অনেক হয়েছে, তুমি চারটি খেয়ে নাও, তার পর দুজনে প্রাণপণে চেষ্টা করবো, যদি কোন রকমে বাঁচাতে পারি।

হরিনাথ। আমার ত ক্ষুধা নাই।

সুশীলা। ভয়ে ক্ষুধা নেই সত্য, কিন্তু সমস্তদিন ত কিছু খাওনি। কাল কতক্ষণ যে খেতে পাবে না তারি বা ঠিক কি? খাও, যা পার দুটি খাও। কিছু ভয় নেই মা, দুর্গা কখন নিদয় হবেন না।

আহা বালিকার কি বিশ্বাস। পত্নীর কথায় হরিনাথ আহারে বসিলেন। কিন্তু আহার করে কে? দুই চারি গ্রাসের পরই তিনি আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

স্বামীর আচমন হইলে, সুশীলা তাঁহাকে একখানি নীলাম্বরী কাপড় দিয়া বলিলেন, "এইখানা পরে তুমি দুর্গানাম স্মরণ করে আমাদের এই ঘরের কাছে যে আম গাছটা আছে এতে উঠে যাও, দেখ যেন ভয়ে পড়ে যেও না, বরং উপরে উঠে কোচার কাপড় দিয়ে ডালের সঙ্গে তোমার শরীর বেঁধে ফেল।"

হরিনাথ। তা হলে কি হবে? কাল সকালেত আমায় মেরে ফেলবে।

সুশীলা। কাল সকাল পর্য্যন্ত বাঁচ্লে আমি পুলিশ আন্য়ে তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। আর দ্বিধা করো না, ওঠ গে।

হরিনাথের এই বার অনেক ভরসা হইল। লোকে ডুবিয়া যাইবার সময় সামান্য তৃণ অবলম্বন করিয়াও বাঁচিবার চেষ্টা করে। এত তাহা অপেক্ষা শক্ত অবলম্বন। হরিনাথ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

সুশীলা গলায় অঞ্চল দিয়া করজোড়ে সজল নয়নে বলিলেন "কি হবে মা!"—দর দর ধারে গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল, কিয়ংক্ষণ পরে "মা! তোর মনে যা আছে তাই হবে। বলিয়া একটি জলের ঝারি ও প্রদীপ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

এ দিকে দস্যুগণ ভগিনীপতিকে বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসিয়াই তাঁহার ভৃত্যের মুখ বাঁধিয়া চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল।

এক জন বলিল, "বেটাকে মেরে ফেল।"

জ্যেষ্ঠ বলিল, "না এখন থাক, আগে তাকে সাবাড় করি, তার পর একে। কিন্তু সুশীলা বাস্তবিক সুশীলা, আমাদের বিপদের কথা শুনে কেমন সহজে সম্মত হলো। হাজার হউক আমাদের বোন কি না?" এইরূপে কিয়ংক্ষণ কথোপকথনের পর সকলে আহারাদির জন্য বাটীর ভিতর গমন করিল।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, খিড়কী দ্বারে কে আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল "কেও দাঁড়িয়ে?"

উত্তর। দাদা আমি গো।

দাদা। কেও সুশীলা! তুমি ওখানে কেন?

সুশীলা। এ দেখ দাদা, তিনি পেট কেমন কর্‌চে বলে বাহিরে গেলেন, এখনো আস্‌চেন না কেন বল দেখি?

দাদা। এই যে সর্ব্বনাশ করেছিস্! শালাকে ছেড়ে দিছিস্?

সুশীলা। আমি কি জানি যে তিনি পালাবেন। তিনি খেতে বসে দুচার গাল খেয়েই ঐ কথা বলে উঠ্লেন। আমি প্রদীপ নিয়ে তাঁকে দাঁড়াতে এসেছি। তা

পালাবে কোথায় ? এ দেশতো তোমাদের মুঠোর ভেতর,—আর সে কখনো আসেনি, পথ ঘাট চেনে না, কোথায় বনে জঙ্গলে নুকিয়ে আছে। চল সকলে মিলে খুঁজিগে, কদ্দুর যাবে।

খাওয়া দাওয়া সব ঘুচিয়া গেল। তখনি বড় বড় মশাল প্রস্তুত হইল। সপ্ত ভ্রাতায় ভগিনীপতির প্রাণনাশের জন্য তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। সঙ্গে সুশীলাও একটা মশাল লইয়া বাহির হইলেন।

সকলে এ দিক ওদিক করিতে করিতে দূরে দূরে চলিল। সুশীলা থানার পথ ধরিয়া চলিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। থানার দারোগা নিশাভ্রমণে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় পতিপ্রাণা সুশীলা প্রাণের ভয়ে লজ্জা ভয় জলাঞ্জলি দিয়া "বাবা, রক্ষা কর" বলিয়া থানার দ্বারে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। দারোগা "কি হয়েছে মা, কি হয়েছে মা" বলিয়া কয়েক জন কনষ্টেবল সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বালিকা মূর্চ্ছিতা।

এক জন হিন্দুস্থানী চৌবে তাহার মুখে জল সেচন করাতে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। তিনি বলিলেন, "বাবা, শীঘ্র চল, তোমরা সকলে মিলে চল, বুঝি এতক্ষণে ডাকাতে আমার স্বামীকে খুন কর্‌লে।"

পুলিস তাহাই চায়। "কোন্ দিকে ডাকাত চল মা" বলিয়া দারোগা কয়েক জন কনষ্টেবল সঙ্গে সুশীলার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ডাকাইতির নাম শুনিয়া সকলে অস্ত্র শস্ত্র লইলেন।

ক্রমে ক্রমে সুশীলা পুলিশ সমভিব্যাহারে বাটিতে পৌছিলেন। বাটীতে জনমানব নাই, কেবল হরিনাথের চৌবে খুঁটির গায়ে বাঁধা। দারোগা তাহার বন্ধন মোচন করিলেন, এবং সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! ডাকাত কৈ ?" সুশীলা বলিলেন, "তারা আমার স্বামীকে খুঁজতে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে, আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আর এক জন দেখুন আমার স্বামী ঐ আম গাছে উঠে আছেন, তিনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা ?"

এই কথা শ্রবণমাত্র চৌবে প্রভুর উদ্ধারার্থ গাছে উঠিল। দেখিল প্রভু অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন, তখন সে পুনরায় আরোহণ করিয়া জল লইয়া উপরে উঠিল, এবং মুখে চক্ষে জল দিয়া তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন পূর্ব্বক বলিল "বাবু! থানেকা দারোগা সাহেব চৌকীদার লোগোঁকো লোকের ইহাঁ আয়া হায়।" উতর চলিয়ে, আওর কুছ ডর নেহি।" তখন হরিনাথ ভৃত্যসঙ্গে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইল। দস্যুগণও ক্রমে মশাল ও অসি হস্তে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের দুরদৃষ্টফলে বাটী মধ্যে

যে যেমন প্রবেশ করিতে লাগিল অমনি পুলিস প্রহরী একে একে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। এই রূপে সপ্তজন বন্দী হইলে হরিনাথ বলিলেন, আর নাই। সুশীলা এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী দণ্ডায়মানা আছেন। দস্যুরা এখনো জানে না যে, তাহাদের ভগিনীরই এই কাজ। তাহারা মনে করিল হরিনাথই এই কাণ্ড করিয়াছে।

দারোগা নিজের পকেট বইতে কতকগুলি কি লিখিয়া এক খানি কাগজে কি লিখিলেন, এবং হরিনাথের হস্তে দিয়া বলিলেন "তোমার পত্নী আমাদিগকে ডাকাইত ধরিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, এজন্য গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত হাজার টাকা পাইবে, এই কাগজ হেড আফিসে দাখিল করিলে আপনি ঐ টাকা আদায় হইবে।

ভগিনী তাহাদিগের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে শুনিয়া জ্যেষ্ঠ দস্যু বলিল, "সুশীলা, তোর মনে এই ছিল?"

সুশীলা স্থির গভীর স্বরে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে বলিলেন—

"জগজ্জননীর মনে এই ছিল, কে জানিত!"